কোকোদ্বীপের বিভীষিকা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

প্রজাপতি এবং হয়গ্রীব| ডঃ আলবের্তো ভাস্কোর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের জাদুঘরসদৃশ ড্রয়িংরুমে। ওঁর মাতৃভাষা পর্তুগিজ। কিন্তু ভাল ইংরেজি জানেন। কর্মসূত্রে থাকেন প্রশান্ত মহাসাগরের তাহিতি দ্বীপে। সেখানকার প্রকৃতি-পরিবেশ দফতরের অধিকর্তা। বাঙ্গালোরে এশিয়া পরিবেশ সংরক্ষণ সম্মেলনে এসেছিলেন।

আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে কর্নেল বললেন, ডঃ ভাস্কো আমার মতোই একজন লেপিডপ্টারিস্ট। প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার—আমাদের প্রিয় হালদারমশাই আমি যাওয়ার আগেই সেখানে হাজির। তিনি অবাক চোখে সম্ভবত সায়েব-দর্শন করছিলেন। বলে উঠলেন, কী কইলেন খ্যান?

হালদারমশাইয়ের মুখ থেকে মাঝে-মাঝে দেশোয়ালি ভাষা বেরিয়ে আসে। কর্নেল বললেন, লেডিপপ্টারিস্ট। যারা প্রজাপতি নিয়ে গবেষণা করেন।

গোয়েন্দা-ভদ্রলোক যেন হতাশ হলেন। একটিপ নস্যি নিয়ে খবরের কাগজে চোখ রাখলেন। বুঝলাম, ডঃ ভাস্কো সম্পর্কে ওঁর আগ্রহ উবে গেছে।

কর্নেল ডঃ ভাস্কোকে বললেন, আপনি নেচার পত্রিকায় আউল বাটারফ্লাই সম্পর্কে আমার যে প্রবন্ধ পড়েছেন, তা কিছুটা স্মৃতিচারণা। কারণ আমি তখন বয়সে তরুণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রশান্ত মহাসাগরের ফাতু হিভা দ্বীপের সামরিক ঘাঁটি থেকে যুদ্ধজাহাজে দেশে ফিরছিলাম। কোকো দ্বীপের পাশ দিয়ে আসার সময় বাইনোকুলারে জনমানবহীন দ্বীপটিতে ঝাঁকে-ঝাঁকে আউল বাটারফ্লাই দেখেছিলাম। কালিগো আপ্রেউস প্রজাতির এই প্রজাপতি আকারে বিশাল। এক-একটা ডানা ছ ইঞ্চি চওড়া। ডানায় দুটো করে গোল চোখের মতো ছোপ। হঠাৎ দেখলে প্যাঁচা মনে হয়। তাই ওই নাম। তবে সেই প্রথম এবং শেষ দেখা।

ডঃ ভাস্কো বললেন, কোকো দ্বীপ সম্পর্কে আপনি একটা সাংঘাতিক গুজবের উল্লেখ করেছেন।

কর্নেল হাসলেন। গুজব এখনও চালু আছে নাকি?

আছে। এবং গুজবটা যে মিথ্যা নয়, সেই কথাটা ফেরার পথে আপনাকে জানিয়ে যাওয়া উচিত মনে করলাম। ডঃ ভাস্কো গম্ভীর হয়ে বললেন, জানুয়ারিতে আপনার প্রবন্ধ পড়ার পর ছোট একটা টিম নিয়ে কোকো দ্বীপে গিয়েছিলাম। দ্বীপটি এখনও নির্জন। টিমে ছিলাম আমি, আমার সহকারী বিজ্ঞানী পিটার গিলম্যান, রাঁধুনি আউ তিউ, দুজন গার্ড তিয়া এবং জুয়া। এরা তিনজন তাহিতির লোক। গিলম্যান মার্কিন। তো পরদিন রাঁধুনি আর দুজন গার্ড নিখোঁজ হয়ে গেল। ভাবলাম, ভূতুড়ে দ্বীপে আসতে ওদের খুব আপত্তি ছিল। তাই পালিয়ে গেছে। মোটরবোটটা বিচ থেকে টেনে এনে ক্যাম্পের সামনে রাখা ছিল। সেটা আছে। তবে ফাতু হিভা থেকে নারকোলছোবড়া আর শুটকি মাছ আনতে অনেক ছোট জাহাজ কোকোর পাশ দিয়ে যায়। কাজেই ওদের পালানোর সুযোগ আছে। কিন্তু বিকেলে ফার্নের ঘন জঙ্গলে তিনজনের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ আবিষ্কার করে চমকে গেলাম। গার্ডদের রাইফেল কোনও হিংস্র জন্তু যেন দাঁতে চিবিয়ে ভেঙেছে। আশ্চর্য ব্যাপার, জন্তুটা মৃতদেহ থেকে মাংস খায়নি।

হালদার মশাই নড়ে উঠলেন। কন কী বলেই শুধরে নিলেন, ভেরি মিটিরিয়াস!

ডঃ ভাস্কো বললেন, আমাদের সঙ্গে পেট্রোম্যাক্স বাতি আর টর্চ ছিল। তখন আমরা নিরস্ত্র। দুটো ক্যাম্প গুটিয়ে জিনিসপত্র মোটরবোটে বোঝাই করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সবে জ্যোৎস্না উঠেছে। গিলম্যান এবং আমি মোটরবোট ঠেলতে-ঠেলতে বিচে নামাচ্ছি। হঠাৎ ঘোড়ার মতো বিকট চি-হি-হি ডাক শুনে টর্চের আলো ফেললাম। আশ্চর্য, কর্নেল সরকার। ঘোড়ার মতো মুখ, মানুষের মতো শরীর একটা জন্তুকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখতে পেলাম। জন্তুটা সম্ভবত আলো সহ্য করতে পারে না।

কর্নেল হাসলেন, কোকো দ্বীপে ঘোড়া-মানুষের গুজব তা হলে সত্যি?

নিজের চোখকে অবিশ্বাস করা যেত। কিন্তু গিলম্যানও দেখেছে।

আপনি আর কোকো দ্বীপে যাননি?

কোকো দ্বীপের মালিকানা নিয়ে ফরাসি এবং মার্কিন সরকারের মধ্যে বিতর্ক আছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ওখানে কোনও দেশ সশস্ত্র বাহিনী পাঠাতে পারে না। এমনকী, কেউ সেখানে যেতে পারে না। আমরা গোপনে গিয়েছিলাম প্যাঁচা প্রজাপতির খোঁজে। নইলে তো সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়ে হিংস্র ঘোড়া-মানুষটাকে খুঁজে বের করা যেত। যাই হোক, ঘটনাটা আমরা চেপে গিয়েছিলাম।

কর্নেল চোখ বুজে সাদা দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন। বললেন, আবার একটা টিম নিয়ে গোপনে কোকো যাওয়া উচিত। আপনি আপনার দপ্তরকে বলে ব্যবস্থা করতে পারেন?

ডঃ ভাস্কো একটু ভেবে নিয়ে বললেন, তা করা যায়। আপনি যেতে চান?

হ্যাঁ। আমি এবং আমার এই তরুণ সাংবাদিক বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরি...

হালদারমশাই বলে উঠলেন, কর্নেলসার, আমাকে বাদ দেবেন না। চৌত্রিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। তারপর ইংরেজিতে ডঃ ভাস্কোকে বললেন, সার, ইউ নিড অলসো এ প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

ডঃ ভাস্কো ঘড়ি দেখে বললেন, হোটেলে ফিরে ট্রাঙ্ক-কলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব। তারপর জানাব। আমার ফ্লাইট বেলা একটা তিরিশে। এবার চলি, কর্নেল সরকার! সবকিছু ঠিকঠাক করতে পারলে আবার দেখা হবে।

ডঃ ভাস্কো চলে যাওয়ার পর বললাম, আজগুবি ব্যাপার! ওঁরা কী দেখতে কী দেখেছেন।

কর্নেল টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, ঘোড়া-মানুষ! হয়গ্রীব বলা চলে। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে হয়গ্রীবের কথা আছে। মহাভারতে আছে, বিষ্ণু হয়গ্রীব রূপ ধারণ করে বেদ-চোর দৈত্য মধুকৈটভকে নিধন করেছিলেন। দেবীভাগবত পুরাণ আর শ্রীমদ্ভাগবতে আছে হয়গ্রীব দৈত্যকে বধ করতে বিষ্ণু হয়গ্রীব রূপ ধারণ করেছিলেন। বিষে-বিষে বিষক্ষয়! হালদারমশাই বললেন, শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হয় না জয়ন্তবাবু!

বললাম, ঠিক, কিন্তু হয়গ্রীব বলুন কি ঘোড়া-মানুষ বলুন, তার সঙ্গে দেখছি মার্ডার জড়িয়ে আছে!

তা হলে গুপ্তধনও আছে?

থাকতেই পারে।

কোকো দ্বীপে আলবাত আছে। কোনও পর্তুগিজ জলদস্যুসর্দার মরে ভূত হয়ে তা পাহারা দিচ্ছে। কেউ গেলেই ঘোড়া-মানুষের রূপ ধরে তার ঘাড় মটকে মারছে।

হালদারমশাই খি-খি করে হেসে উঠলেন, কী যে কন!

কর্নেলও এবার অট্টহাসি হাসলেন। তারপর হাঁকলেন, ষষ্ঠী! কফি।

লোকটা কে? | ডঃ ভাস্কো টেলিফোনে কর্নেলকে জানিয়ে গিয়েছিলেন, তার দফতর কর্নেল সরকারের প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখবেন। কথাটা শুনে হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু দিন বিশেক পরে মার্চের মাঝামাঝি কলকাতার ফরাসি কনসুলেটের মারফত সরকারি আমন্ত্রণপত্র এসে গেল।

সেই চিঠিতে হালদারমশাইয়ের নামও ছিল। খবর পেয়ে গোয়েন্দপ্রবর কর্নেলের ডেরায় এসে উত্তেজিত ভাবে ঘন-ঘন নস্যি নিচ্ছিলেন। কর্নেল তাকে চমকে দিয়ে বললেন, আমার এবং জয়ন্তের আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট আছে। আপনার পাসপোর্ট আছে কি?

পাসপোর্ট? খাইছে! পাসপোর্ট পামু কই?

হালদারমশাই করুণ মুখে তাকালে কর্নেল তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, ভাববেন না। ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু মনে রাখবেন, ফর্মে পেশার জায়গায় লিখতে হবে অর্নিথোলজিস্ট। পক্ষিবিজ্ঞানী।

সর্বনাশ! পক্ষীর আমি কী জানি?

দুটো ডানা আছে, এটুকু তো জানেন? ডানা মেলেই পাখি ওড়ে, তা-ও জানেন।

হঃ।

পাখিদের নামও জানেন! কাক, চড়ুই, টিয়া, শালিখ, ময়না, বক, কাদাখোঁচা...

বাহ! তবে এগুলো বাংলা নাম। আপনাকে আমি পাখি বিষয়ে সচিত্র একটা বই দিচ্ছি। মুখস্থ করে নেবেন। এতে দেশ-বিদেশের পাখির ইংরেজি নাম এবং প্রজাতির আন্তর্জাতিক নাম আছে।

হালদারমশাই চিন্তিত মুখে বললেন, ক্রিমিনোলজিস্ট লিখলে চলবে না?

না। আর-এক কাজ করুন। আজই চৌরঙ্গিতে গিয়ে একটা বাইনোকুলার কিনে নিন।

আপনার গলায় যে যন্তরটা ঝোলে?

হ্যাঁ। তবে একটা অসুবিধে হবে। পুলিশমহল আপনাকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে চেনে। পাসপোর্টের ব্যাপারে তদন্ত করবে। ভাববেন না। আমি বলে রাখব কর্তৃপক্ষকে। পুলিশকে এ-যাবৎ অনেক সাহায্য করেছি। ওঁরা আশা করি আমার কথা রাখবেন।

কর্নেলের তদ্বিরে হালদারমশাইয়ের পাসপোর্ট খুব শিগগির হয়ে গেল। ফরাসি কনসুলেট থেকে পনেরো দিনের ভিসাও মঞ্জুর হল। আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে তিনজনের প্লেনের টিকিট ছিল। আমরা যাচ্ছি তাহিতির প্রকৃতি পরিবেশ রক্ষার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবস্থা পরিদর্শনে।

তাহিতি ফ্রান্সের উপনিবেশ। ফরাসি গভর্নরের অধীনে লোকদেখানো স্বায়ত্তশাসন আছে। কর্নেলের কাছে তাহিতির লম্বা-চওড়া যে ইতিহাস শুনলাম, তা আমার মাথায় ঢুকল না। হালদারমশাই পাখির বইটি বিড়বিড় করে মুখস্থ করেছিলেন। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেন তখন সপ্তাহে একদিন লন্ডন থেকে দমদম হয়ে হংকং যায়। আমরা সেই প্লেনের যাত্রী। তারপর হংকং থেকে প্যান অ্যামের লস

অ্যাঞ্জেলিসগামী প্লেনে তাহিতির রাজধানী পাপিতির ফা-আ-আ এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। ডঃ ভাস্কো গাড়ি নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, সুস্বাগতম।

হালদারমশাই বাইনোকুলারে চোখ রেখে বললেন, খালি ফুল দেখি। পাখি কই?

কর্নেল বললেন, তাহিতিকে স্বর্গদ্বীপ বলা হয়। জানেন তো? এখানকার আদি বাসিন্দারা সবসময় ফুলের সাজ পরে থাকে।

হালদারমশাই হঠাৎ দুই কানে আঙুল খুঁজে পুঁতোগুঁতি করতে করতে বললেন, কান কটকট করে। ব্যথা।

উঁচু আকাশপথে প্লেনযাত্রায় এটা অনেকের হয়।

ডঃ ভাস্কো গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁর পাশে কর্নেল। পেছনের সিটে আমি এবং হালদারমশাই। মসৃণ কালো রাস্তা, ঘন ঘাসে ঢাকা ঢেউখেলানো মাটি। নিবিড় ফার্নের জঙ্গল। নির্জন রঙিন বাড়ি। আর শুধু ফুল। যেন ছবির দেশে ঢুকেছি। হালদার-মশাই হঠাৎ আমার হাত খামচে ধরে উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, বুগেনভিলিয়া। বুগেনভিলিয়া।

বুঝলাম, এতক্ষণে এখানকার একটা ফুল চিনতে পেরেছেন। কর্নেল মুখ ঘুরিয়ে তাকে। বললেন, জানেন তো? এই ফুলের আদি বাসস্থান এখানে। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি অভিযাত্রী বুগেনভিলে এই দ্বীপে এসেছিলেন। তিনিই এই ফুলের চারা স্বদেশে নিয়ে যান। সেখান থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর অন্যত্র। তাঁর নামেই ফুলের নাম।

ডঃ ভাস্কো বললেন, ফরাসি উচ্চারণে তাঁর নাম দ বুর্গেভিল।

হালদারমশাই মুগ্ধভাবে বললেন, গাড়িটা যেন ফ্লাইং বার্ড। ননা সাউন্ড। মাখন বাটার!

কর্নেল বললাম, আচ্ছা কর্নেল, বাটারের সঙ্গে কি বাটারফ্লাইয়ের কোনও সম্পর্ক আছে?

কর্নেল বললেন, অবশ্যই আছে। একই গ্রিক শব্দ থেকে...

ডঃ ভাস্কোর কথায় উনি থেমে গেলেন। এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র চার মাইল দূরে রাজধানী পাপিতি। তবে আমরা পাপিতিতে ঢুকব না। তাহিতির গড়ন ইংরেজি আটের মতো। দুটো গোলাকার বড়-ছোট ভূখণ্ড জোড়া দিলে যেমন দেখায়। আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। জোড়ের কাছে। সমুদ্রের ধারে আমাদের দফতরের গেস্ট হাউস। আশা করি আপনাদের ভালই লাগবে। ওখানে বিচটা অসাধারণ।

আমরা একটা ছোট্ট নদী পেরিয়ে গেলাম। ডঃ ভাস্কো গাইডের ভঙ্গিতে বিবরণ দিচ্ছিলেন। নদীটার নাম পাপেনু। ওই নারকোলবাগানের ওধারে গেলে তাহিতির শেষ স্বাধীন রাজা পঞ্চম পোমারির কবর দেখা

যাবে। আরও উত্তরে পয়েন্ট ভেনাস। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ অভিযাত্রী জেমস কুক সূর্যের সামনে দিয়ে শুক্রগ্রহের পরিক্রমা পর্যবেক্ষণের জন্য এসেছিলেন।

কর্নেল আস্তে বললেন, কুক ট্রানজিট অফ ভেনাস দেখতে এসেছিলেন।

ডঃ ভাস্কো আওড়াচ্ছিলেন, জোড়ের পর দ্বিতীয় ভূখণ্ডের নাম তাহিতি ইতি। প্রকৃতিপরিবেশ দফতরের বাংলার কাছে মা-উ-উ গ্রাম। সেখানে একটা ছোট বাংলো আছে। বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখক সমারসেট মম সেই বাংলোয় বসে বিখ্যাত ফরাসি চিত্রকর গগ্যাঁকে নিয়ে মুন অ্যান্ড সিক্স পেন্স নামে বই লিখেছিলেন। গগ্যাঁ থাকতেন পুনা-আ-উ-ই- আ বসতি এলাকায় ভিলা ভেতুরা নামে একটা বাড়িতে। তাহিতির একজন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। মমের বাংলো এবং গগ্যাঁর বাড়ি কাল মঙ্গলবার আমাদের দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হালদারমশাই নড়ে উঠলেন। অ্যাঃ, কাইল মঙ্গলবার হইলে আইজ সোমবার। আমরা দমদমে প্লেনে উঠছি শুক্রবার মর্নিংয়ে। দুইটা দিন গেছে। আইজ রবিবার। সানডে!

কর্নেল হাসলেন। হালদারমশাই! আমরা অন্তর্জাতিক তারিখরেখার পূর্বে চলে এসেছি। ওই রেখার পশ্চিমে যখন রবিবার, তখন পূর্বে সোমবার।

কন কী? একই দিনে দুই তারিখ!

হ্যাঁ। পরে আপনাকে বুঝিয়ে দেব।

হালদারমশাই গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে রইলেন। সরকারি বাংলোয় পৌঁছতে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল। লনে ফুল-বাগিচা, রঙিন টালির ঢালু ছাদ এবং দেওয়ালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাহারি লতা-বাংলোটা সত্যিই অতুলনীয়। দুজন সশস্ত্র রক্ষী সেলাম দিল গেটে। তাদের তাহিতির লোক বলে মনে হল। একজন উর্দিপরা দৈত্যাকৃতি লোক এসে আমাদের লাগেজ নিয়ে গেল।

এয়ারকন্ডিশনড বাংলোয় ঢুকে ডঃ ভাস্কো বললেন, ওর নাম হুয়া, একসময় আমেরিকায় ছিল। তাই ইংরেজি জানে। খুব বিশ্বস্ত লোক। এখন স্থানীয় সময় বিকেল তিনটে। আপনারা ঘড়ি মিলিয়ে নিন। সাড়ে চারটেয় সূর্যাস্ত। আমরা পাঁচটায় ডিনার খাই। আপনারা কখন খাবেন বলে দেবেন। হুয়া আপাতত কফি আর হালকা কিছু খাবার আনো!

হুয়া চলে গেল। হালদারমশাই বললেন, বেডরুম কই? হোয়্যার ইজ দি বেডরুম?

ডঃ ভাস্কো ওঁকে বেডরুম দেখিয়ে দিলেন। উনি তখনই ঢুকে গেলেন। বললাম, হালদারমশাইয়ের খিদে পাওয়ার কথা। কিন্তু হঠাৎ বেডরুমে ছুটলেন কেন?

আমরা ড্রয়িংরুমে বসে ছিলাম। চারদিকে র‍্যাকভর্তি বই এবং সুদৃশ্য টবে রকমারি খুদে উদ্ভিদ। একটু পরে হুয়া কফি এবং খাবার ভর্তি ট্রে আনল। ডঃ ভাস্কো সেই বেডরুমের দরজা খুলে হালদারমশাইকে ডাকতে গেলেন। তারপর ফিরে এসে মুচকি হেসে বললেন, ডিটেকটিভ ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, ডিটেকটিভ নন। উনি অর্নিথোলজিস্ট।

ডঃ ভাস্কো হাসলেন, ঠিক। ঠিক। ভুলে গিয়েছিলাম। এবার আমাদের প্রোগ্রামের কথা বলি। কাল বিকেলে পাপিতি-ইতির আহি বন্দর থেকে একটা প্রাইভেট কোম্পানির জাহাজ যাবে ফাতু হিভা দ্বীপে। ওরা যাবে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে। পাতু হিভা মার্কিন তদারকে আছে। কিন্তু দ্বীপবাসীরা মার্কিন খাদ্য পছন্দ করে না। তা ছাড়া ওরা ডলারে দাম মেটাতে পারে না। তাই পণ্যবিনিময় প্রথা এখনও চালু আছে। খাদ্যের বদলে নারকোলছোবড়া, শুটকি মাছ, এক ধরনের সামুদ্রিক শ্যাওলা দেয়। সেই শ্যাওলা কিন্তু সুস্বাদু। খাবেন নাকি?

খাব।

হুয়াকে বলে দিচ্ছি। তো কাল ওই জাহাজে আমাদের দুটো মোটরবোট থাকবে। আমরা সূর্যাস্তের আগেই কোকো পৌঁছে যাব। এবার তৈরি হয়েই যাচ্ছি। সঙ্গে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র থাকবে।

ডঃ ভাস্কো চলে যাওয়ার পর কর্নেল বললেন, হালদারমশাই ঘুমিয়ে নিন। চলো, আমরা বিচ থেকে একবার ঘুরে আসি। এখানে খুব শিগগির সন্ধ্যা হয়ে যায়।

হুয়াকে বলে আমরা বাংলোর পূর্ব গেট দিয়ে বিচে নেমে গেলাম। ওদিকে কোনও রক্ষী নেই। কিন্তু কে বলে প্রশান্ত মহাসাগর প্রশান্ত? গর্জনে কানে তালা ধরে যাচ্ছিল। আর হাওয়া নয়, যেন সাইক্লোন বয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত সরকারি সংরক্ষিত এলাকা বলে ছোট্ট বিচ জনশূন্য। কর্নেল বাইনোকুলারে সামুদ্রিক পাখির ঝাঁক দেখছিলেন। তারপর যেন বিশেষ কোনও পাখিকে অনুসরণ করার মতো বাঁ দিকে ঘুরলেন। অদূরে উঁচু টিলা। একটা হোটেল দেখা যাচ্ছিল সেখানে। বাইননাকুলার নামিয়ে কর্নেল বললেন, অদ্ভুত!

চমকে উঠে বললাম, কী অদ্ভুত?

ওই লোকটা!

কোন লোকটা?

দমদমে ওকে দেখেছি। হংকংয়ে দেখেছি। ফা-আ-আ এয়ারপোর্টেও দেখেছি। গোয়র পর্তুগিজ বংশোদ্ভূতদের মতো দেখতে। তো ওই হোটেলটার নাম দেখলাম, ফারাতিয়া। লোকটা বাইনোকুলারে আমাদের দেখছিল।

দেখতেই পারে। আপনি যেমন দেখছিলেন। নিছক কৌতূহল।

লোকটা জাহাজের নাবিক ছিল। কিংবা এখনও নাবিক। কারণ ওর বাহুতে উল্কি দেখেছি। নাবিকদের উল্কি এঁকে নেওয়ার হবি আছে। ওর গায়ে ছিল নেভিব্র স্পোর্টিং গেঞ্জি। হংকং এয়ারপোর্টে ট্রানজিট লাউঞ্জে চোখাচোখি হতেই সে সরে যাচ্ছিল, সেই সময় ওঁর বাঁ বাহুতে উল্কিটা আমার চোখে পড়ে। আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল ছিল। এক পলকের দেখা। উল্কিটা ঘোড়া-মানুষের।

মনে-মনে একটু ভড়কে গিয়ে বললাম, খোঁজ নিলে হয়তো দেখবেন লোকটা এই তল্লাটে কোনও জাহাজে চাকরি করে। এখানকার নাবিকদের হয়তো কিংবদন্তিখ্যাত ঘোড়া মানুষের উল্কি এঁকে নেওয়ার হবি আছে।

কিন্তু একজন সাধারণ নাবিক তাহিতির সেরা অভিজাত হোটেল ফারাতিয়ায় উঠেছে এবং আমাদের দিকে লক্ষ্য রেখেছে। ব্যাপারটা গোলমেলে।

কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে গেস্টহাউসে ফিরলেন। ড্রয়িংরুমে টেলিফোন ছিল। ডঃ ভাস্কোর সঙ্গে উনি চাপা গলায় কথা বলতে থাকলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়নি। তাই সেই বেডরুমে ঢুকে পড়লাম। দেখি, গোয়েন্দা ভদ্রলোক চিত হয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। বাইনোকুলার খাট থেকে ঝুলছে। ফিতে গলায় আটকানো। জুতোও খোলেননি। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিয়ে ডাকলাম, হালদারমশাই! হালদারমশাই!

তিনি তড়াক করে উঠে বসলেন সঙ্গে-সঙ্গে। এয়ারপোর্ট আইয়া পড়ল?

নাহ। ঘোড়া-মানুষ।

কই? কই?

ফারাতিয়া হোটেলে।

অ্যাঁ? বলে হালদারমশাই চোখ রগড়ে খি খি করে হেসে উঠলেন। ও! জয়ন্তবাবু! আমি ভাবছিলাম—

কী ভাবছিলেন, তা আর বললেন না। প্রশস্ত এবং সুন্দর করে সাজানো ঘরের সৌন্দর্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে থাকলেন। এই ঘরে দুটো বিছানা। হালদারমশাই হঠাৎ উঠে দ্বিতীয় বিছানার গদি টিপে দেখে যেটায় শুয়ে ছিলেন, সেটার গদি টিপলেন, তারপর বললেন, মাখন, বাটার, কিন্তু হেভি ক্ষুধা পাইছে।

ড্রয়িংরুমে চলুন।

কর্নেল তখন হুয়াকে আবার কফি আনতে বলছিলেন। হালদারমশাইকে দেখে ওঁর জন্য হালকা খাবার আনতে বললেন। হালদারমশাই হাসলেন। প্যাসিফিক ওশেন এখান থেকে কত দূরে কর্নেলসার?

বাংলোর নিচেই। ওই দরজা খুলে বেরোলে বারান্দা। তারপর লন। লন থেকে নামলে বিচ।

বাল্যকালে ভূগোলে পড়েছিলাম। এবার ছুঁয়ে দেখব।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কাল ভোরে বরং দেখতে যাবেন।

এত কাছে-প্যাসিফিক ওশেন! আর তাকে ছোঁব না?

হুয়া কফি আর স্ন্যাক্স আনল। হালদারমশাই গোগ্রাসে খেলেন। তারপর পুবের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। বিচ পর্যন্ত অবশ্য উজ্জ্বল আলো পড়েছে ল্যাম্পপোস্ট থেকে। কর্নেল এবং আমি বেরিয়ে ওদিকের বারান্দায় বসলাম। দেখলাম, হালদারমশাই বিচে নেমে থমকে দাঁড়িয়েছেন। রাতের সমুদ্র দেখে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু হঠাৎ উনি গুঁড়ি মেরে বসলেন এবং বাঁ দিকে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে এগিয়ে অদৃশ্য হলেন।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো তো, দেখি কী ব্যাপার!

বিচে নেমে দেখলাম, হালদারমশাই কার সঙ্গে বালির ওপর জড়াজড়ি কিংবা কুস্তি করছেন। আমরা দৌড়ে যেতেই লোকটা বিচের শেষ প্রান্তে পাথরের চাইয়ে উঠে কাঁটাতারের বেড়া গলিয়ে পালিয়ে গেল। হালদারমশাই ফেস-ফেঁস শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, ঘুঘু দ্যাখছে, ফঁাদ দ্যাখে নাই। চুপিচুপি কাঁটাতারের বেড়া গলিয়ে ব্যাটা যেই নিচে জাম্প করেছে। পড়েছে আমার কোলে। বলে গোয়েন্দাপ্রবর খি খি করে হাসতে লাগলেন।

অদ্ভুত চিঠি এবং হত্যাকাণ্ড|কর্নেল ঘটনাটা হুয়াকে জানাতে নিষেধ করেছিলেন। হালদারমশাইয়ের মতে, লোকটা চোর। সামনে দু-দুটো গার্ড রেখেছে। এদিকে পেছনে চোর আসার রাস্তা পরিষ্কার। চোর কি সামনের দিক দিয়ে আসে? গভর্নমেন্টের কাজ-কারবার সব দেশেই এক।

বুঝলাম, প্রাক্তন দুঁদে দারোগা হাত ফসকে চোর পালানোর জন্য খাপ্পা হয়ে গেছেন। কিন্তু এবার আমার মনে আতঙ্কের ছায়া পড়েছিল। কর্নেল আবার টেলিফোনে ডঃ ভাস্কোর সঙ্গে কথা বললেন। তারপর চুরুট ধরিয়ে র্যাক থেকে একটা প্রকাণ্ড বই টেনে নিয়ে বসলেন। আমি পোশাক বদলে এলাম।

দেখাদেখি হালদারমশাইও বদলে এলেন। সময় কাটছিল না। হালদারমশাই ক্রমাগত গোঁফে তা দিচ্ছিলেন এবং দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে গুঁতোগুঁতি করছিলেন। কতক্ষণ পরে ডঃ ভাস্কো এলেন। হুয়া আর-এক প্রস্থ কফি দিয়ে গেল।

ডঃ ভাস্কো বললেন, ফারাতিয়া হোটেলে কোনও ভারতীয় নাগরিক ওঠেননি। আজ প্যান অ্যাম ফ্লাইটে যারা এসেছেন, তাঁদের কারও বাহুতে ঘোড়া-মানুষের উল্কি নেই। আমার ভয় হচ্ছে। কর্নেল সরকার, এই তল্লাশির জন্য পর্যটন দফতর চটে যাবে। পর্যটন থেকেই তাহিতির মোট রাজস্বের ৭৫ শতাংশ আসে।

কর্নেল বললেন, তা হলে লোকটা অন্য কোথাও উঠেছে। সে ফারাতিয়ার পূর্ব লনে ঢুকেছিল আমাদের ওপর নজর রাখতে। তারপর সে খাড়ি বেয়ে নেমে বেড়া গলিয়ে বিচে লাফ দিয়ে পড়েছিল।

ঠিক। সায় দিলেন ডঃ ভাস্কো। সে কোন উদ্দেশ্যে আসছিল কে জানে? বিচের দিকে আমরা গার্ড রাখি না। কারণ বিচটা মাত্র পঞ্চাশ মিটার লম্বা। সারারাত আলো জ্বলে। দুধারে খাড়া পাহাড়। বিচটা প্রাচীন যুগে একটা খাড়িই ছিল। যাই হোক, আরও দুজন গার্ড বিচের দিকে রাখা হচ্ছে। তারা এখনই এসে যাবে। আর একটা কথা, সতর্কতার জন্য আমাদের প্রোগ্রাম বদলেছি। জাঁ ব্লকের জাহাজে যাচ্ছি না। একটা ট্রলার কোকো দ্বীপের ওদিকে মাছ ধরতে যায়। ট্রলারের একটা সুবিধে আছে। দ্বীপের খুব কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। কাজেই আমাদের মোটরবোটের দরকার হবে না। দুটো রবারের ভেলাই যথেষ্ট।

হালদারমশাই উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, হঠাৎ দরকার হলে আমরা কি ভেলায় চেপে ফিরতে পারব?

কর্নেল বললেন, ভয় নেই হালদারমশাই। ভেলা অকূলে ভেসে যাবে না। হাজার-হাজার দ্বীপের মধ্যে যে-কোনও দ্বীপে পৌঁছে দেবে। অবশ্য সেখানে ঘোড়া-মানুষের চেয়ে সাংঘাতিক প্রাণীও থাকতে পারে।

হালদারমশাই দেশোয়ালি ভাষায় বললেন, না, না। তা কইতাছি না।

ডঃ ভাস্কো বললেন, আমাদের সঙ্গে ব্যাটারিচালিত রেডিয়োট্রান্সমিটার থাকবে। সিগন্যাল রিসিভিং সেট থাকবে ট্রলারের মালিক আইউংয়ের কাছে। সে কাছাকাছি দ্বীপগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াবে। সিগন্যাল পেলেই হাজির হবে। আইউং চিনা জেলে। তাহিতিতে যৌবনে পালিয়ে এসেছিল। সে আমাদের সরকারের বিশ্বস্ত লোক। মাছ ধরতে গিয়ে অন্য দেশের যুদ্ধজাহাজের গতিবিধির খবর এনে দেয়।

এদিকে জাঁ ব্লাক কোম্পানি ফরাসি হলে কী হবে। তাদের নাবিকরা মাতাল হলেই বেফাঁস কথা উগরে দিয়ে নিজের সরকারকেই বেইজ্জত করে।

হুয়া এসে জানাল, দুজন গার্ড এসেছে।।

ডঃ ভাস্কো উঠে দাঁড়ালেন, তা হলে চলি কর্নেল করকার! আমি গার্ডদের নির্দেশ দিয়ে নিরাপত্তাবাহিনীর গাড়ির সঙ্গে ফিরে যাব। শুকনো হাসি হাসলেন প্রকৃতিবিজ্ঞানী। সত্যি বলতে

কী, আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি।

কর্নেল বললেন, চিয়ার আপ ডঃ ভাস্কো! ঘোড়া-মানুষের চেয়ে স্বাভাবিক মানুষ কম বিপজ্জনক। তাকে এঁটে ওঠা সহজ। মিঃ হালদার তাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিলেন! বোঝা যাচ্ছে, তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র বা ছুরিও ছিল না। কাজেই তাকে পাত্তা দেওয়ার মানে হয় না।

হালদারমশাই বললেন, চোর! চোর! ছিচকে চোরের ইংরেজি কী জয়ন্তবাবু?

বললাম, ডিকশনারি দেখতে হবে।

পেটি থিফ! গোয়েন্দাপ্রবর সহাস্যে বললেন, কী কন কর্নেল সার?

কর্নেলসার ডঃ ভাস্কোকে বিদায় দিতে গেলেন। হালদারমশাই প্যান্টের পকেট হাতড়াচ্ছিলেন। নস্যির কৌটা গেল কই? বলে শার্টের বুক পকেটে হাত গুঁজলেন। এই তো, আরে! এটা আবার

কী?

উনি একটা দলাপাকানো কাগজ বের করে ফেলে দিলেন। কাগজটা আমি তুলে নিলাম কার্পেট থেকে। কাগজটার ভঁজ সিধে করে দেখি ইংরেজিতে লেখা একটা অদ্ভুত চিঠি।

মাননীয় কর্নেল সরকার, আপনারা কোথায় যাবেন, আমি জানি। তাই আপনার সাহায্যপ্রার্থী। যদি আজ রাত ১০টা নাগাদ একা বিচে যান, মুখোমুখি সব কথা খুলে বলব। আমি সামান্য মানুষ। আমাকে ভয়ের কারণ নেই।

পি. জি. | হালদারমশাই নস্যি নিয়ে নাক মুছছিলেন। বললেন, ও জয়ন্তবাবু, আমার পকেটে ওটা আইল ক্যামনে?

বললাম, মনে হচ্ছে, চোর বেগতিক দেখে এটা আপনার পকেটে খুঁজে দিয়ে পালিয়েছে।

সে কী! বলে হালদারমশাই হাত বাড়ালেন। দেখি, দেখি!

চিঠিটা কর্নেলকে লেখা। চুপিচুপি বিচ দিয়ে এসে ওই বাংলোয় পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। আপনার পাল্লায় পড়ে সেটা হয়নি। অগত্যা আপনার পকেটে গুঁজে দিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু আজ রাতে কর্নেল বিচে গার্ড মোতায়েনের ব্যবস্থা করে ফেললেন। আহা রে! বেচারা! বলে হালদারমশাইকে চিঠিটা দিলাম।

এই সময় কর্নেল ফিরে গেলেন। হালদারমশাইয়ের হাত থেকে নিয়ে ওঁকে চিঠিটা দিলাম। উনি গম্ভীরমুখে পড়ার পর বুক-পকেটে ঢোকালেন। তারপর অন্য বুকপকেট থেকে একটা টাইপকরা লিস্ট বের করে বললেন, প্যান অ্যামে আজ যারা তাহিতি এসেছে, তাদের নাম-ঠিকানা। ডঃ

ভাস্কো এয়ারপোর্ট থেকে জোগাড় করেছেন একটা কপি। পি জি—

হালদারমশাই বলে উঠলেন, আমাগো নাম নাই?

কর্নেল কান দিলেন না। বললেন, পদ্রো গার্সিয়া। পর্তুগিজ নাম মনে হচ্ছে। আজকাল সন্ত্রাসবাদীদের রুখতে প্লেনযাত্রীদের নাম, ঠিকানা, পরিচয়, গন্তব্য ইত্যাদি সব তথ্য পাসপোর্ট থেকে নিয়ে এয়ারপোর্ট টু এয়ারপোর্ট কম্পিউটার-ব্যবস্থার মাধ্যমে পাঠানো হয়। পেদ্রো গার্সিয়া ভারতীয় নাগরিক। ঠিকানা, রিপন লেন, কলকাতা। বয়স, ৩৫ বছর। পেশায় শিক্ষক। বিশেষ শনাক্তকরণ চিহ্ন, নাকের ডান পাশে জড়ুল। উদ্দেশ্য, পর্যটন কর্নেল চুরুট ধরালেন ব্যস্তভাবে। চোখ বুজে বললেন ফের, হ্যাঁ। এরই হাতে হয়গ্রীবের উল্কি দেখেছিলাম। অথচ সে শিক্ষক। পথে সে আমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছে। বলেনি কেন? এদিকে ডঃ ভাস্কো এর নামের পাশে লিখে রেখেছেন, মা-আ-উ-আ-ইন। রুম নম্বর ৩১। বাহুতে উল্কি দেখতে পায়নি সরকারি গোয়েন্দরা, আশ্চর্য তো!

হালদারমশাই বলেন, একটা কথা বুঝি না। সরকারি বাংলোয় এরা গার্ড রেখেছে কেন? কর্নেলসার বলেছিলেন স্বর্গদ্বীপ। স্বর্গদ্বীপে গার্ড কেন?

কর্নেল চোখ বুজে আছেন। আমি বললাম, নরকের পাপী-তাপীরা যাতে স্বর্গে হানা দিতে না পারে।

ঠিক। ঠিক। সায় দিলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। আচ্ছা হালদারমশাই, আপনি যেদিন পাসপোর্ট অফিসে ফর্ম আনতে গিয়েছিলেন, সেদিন কোনও লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল?

চমকে উঠলেন গোয়েন্দা ভদ্রলোক। হ্যাঁ। লম্বা লাইন ছিল। আমার পেছনে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক ছিলেন। লাইন নড়ে না দেখে উনি বললেন-

তার সঙ্গে আপনার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল কি?

হাঃ। আমিই জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোথায় যাওয়া হবে বললেন, তাহিতি। তখন আমিও বললাম, আরে, আমিও তাহিতি যাব। এই করে আলাপ হয়ে গেল। তাহিতিতে একটা জাহাজ কোম্পানিতে চাকরি করেন ওঁর দাদা। উনি জানতে চাইলেন আমি কেন যাচ্ছি। তখন বললাম, গভর্নমেন্ট ইনভিটেশন। আমি একজন অর্নিথোলজিস্ট। উনি বললেন, সেটা আবার কী? তখন— . কর্নেল চোখ কটমটিয়ে ফের ওঁর কথার ওপর বললেন, তখন সব কথা ফাঁস করে দিলেন আপনি?

বিব্রত মুখে হালদারমশাই বললেন, না, না। ঘোড়া-মানুষের কথা বলিনি। পাচা-প্রজাপতির কথা বলেছিলাম।

মানে-লাইনে দাঁড়িয়ে সময় কাটছিল না। করুণ মুখে নস্যি নিলেন হালদারমশাই, আমি আপনার প্রশংসা করেছিলাম কর্নেলসার। মা-কালীর দিব্যি, খারাপ কিছু বলিনি। তাই শুনেই না উনি বললেন, আপনারা কবে, কোন ফ্লাইটে যাচ্ছেন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।

কর্নেল অনিচ্ছার ভঙ্গিতে হাসলেন। সব বোঝা গেল। কিন্তু শুধু এটাই বোঝা গেল না, কেন পেদ্রো গার্সিয়া আমাকে এড়িয়ে চলল সারা পথ? কেন সে এভাবে গোপনে দেখা করতে চাইল? কী সাহায্য সে চায় আমার কাছে?

কর্নেল টেলিফোনের কাছে গিয়ে ফোন গাইড বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলেন, তারপর ডায়াল করলেন। মা-আ-উ-আ-ইন? আমাকে রুম নম্বর একত্রিশে মিঃ পেদ্রো গার্সিয়াকে দিন। কিছুক্ষণ পরে ফোন রেখে কনেল বললেন, ঘরে রিং হয়ে যাচ্ছে। কেউ ধরছে না।

বললাম, হয়তো বেরিয়েছে। পরে রিং করে দেখবেন। কিন্তু একটা কথা। তার যখন আপনাকে এত দরকার, সে এখানে আপনাকে রিং করছে না কেন?

এ-প্রশ্নের জবাবও পেদ্রো গার্সিয়াই দিতে পারে। বলে কর্নেল বোতাম টিপে হুয়াকে ডেকে ডিনার রেডি করতে নির্দেশ দিলেন!

ডিনারে ডঃ ভাস্কো বর্ণিত সামুদ্রিক শ্যাওলা ছিল। আমার খারাপ লাগল। কিন্তু হালদারমশাই এবং কর্নেল খেতে-খেতে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। খাওয়া শেষ করে সবে ড্রেসিংরুমে ঢুকেছি, টেলিফোন বাজল। কর্নেল সাড়া দিলেন। ডঃ ভাস্কো?...সে কী! কোথায়?... আপনি দয়া করে আসুন। আমি যেতে চাই। বডি যেন না নড়ানো হয়।... না, না ডঃ ভাস্কো! এটা গুরুত্বপূর্ণ।

কর্নেল ফোন রেখে গম্ভীর মুখে বললেন, পেদ্রো গার্সিয়াকে তার ঘরে কেউ খুন করে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে ডঃ ভাস্কোর গাড়ি এল। মা-আ-উ-আ ইনের দিকে ছুটে চলল গাড়ি। পাপেনু নদীর ধারে নিরিবিলি জায়গায় একতলা হোটেল। কেন ইন বা সরাইখানা নাম দেওয়া হয়েছে কে জানে! গিয়ে দেখি, বন্দুকবাজ নিরাপত্তাবাহিনী আর পুলিশ হোটেল ঘিরে রেখেছে। ৩১নং রুম দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এবং তার নিচেই নদী। নদীর ওপারে উঁচু গাছের জঙ্গলে চোখে পড়ল।

পেদ্রো বাথরুমের দরজায় খুন হয়েছে। দরজাটা খোলা। মাথা বাথরুমের ভেতর এবং ধড় বাইরে। উপুড় হয়ে আছে মৃতদেহ। বোঝা যায়, বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছিল, সেই সময় আততায়ী মাথার পেছনে শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করেছে। রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। ডঃ ভাস্কো বললেন, ডাক্তার ফ্লোরোয়াঁর মতে, আপাতদৃষ্টে এই ভদ্রলোক খুন হয়েছেন রাত আটটার আগে। পেছনের দরজা খোলা ছিল। দরজার বাইরে ব্যালকনি। ব্যালকনির নিচে নদী। কাজেই আততায়ীর পালানো সহজ ছিল। রাত সাড়ে আটটায় ডিনার দিতে এসে পরিচারক দরজায় নক করে। বারবার নক করে সাড়া না পেয়ে ম্যানেজারকে খবর দেয়। ইন্টারলকিং সিস্টেমের দরজা। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ম্যানেজার দরজা খুলেই আঁতকে ওঠেন। পুলিশে খবর দেন। আপনার নির্দেশে মিঃ পেদ্রোর দিকে ম্যানেজারকে নজর রাখতে বলেছিলাম। ম্যানেজার আমাকেও খবর দেন। টেলিফোন অপারেটর বলেছে, রাত আটটা পঞ্চাশে কেউ মিঃ পেদ্রোকে রিং করেছিল।

আমি। অপারেটর বলল, ঘরে রিং হয়ে যাচ্ছে। বলে কর্নেল পেছনের ব্যালকনিতে গেলেন। ফিরে এসে ঘরের ভেতরে চোখ বুলিয়ে বললেন, পেদ্রোর লাগেজ সার্চ করা হয়েছে?

হ্যাঁ। সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। কয়েকটা বই, ট্রাভেলগাইড আর জামাকাপড় আছে। একটা ব্যাগে পাসপোর্ট আছে। ক্যামেরা আর ভিউফাইন্ডার আছে—ওই দেখুন!

কর্নেল লাশের দিকে ঝুঁকলেন। পেদ্রোর গায়ে চকরবকরা রঙিন গেঞ্জি। বাঁ বাহুর ওপর কর্নেল টর্চের আলো ফেলে আতস কাচ দিয়ে সম্ভবত হয়গ্রীবের উল্কি খুঁজলেন। দেখলাম, একটা মোটা জজুল আছে। হঠাৎ কর্নেল জড়ুলটা একটানে উপড়ে ফেললেন। একটা হয়গ্রীবের উল্কি দেখে চমকে উঠলাম। ডঃ ভাস্কো বললেন, কী আশ্চর্য!

টা নকল। ইঞ্চিটাক চৌকো স্বচ্ছ সেলোফেনজাতীয় জিনিসের ওপর বসানো। কর্নেল বললেন, লাশটা চিত করতে হবে।

ডঃ ভাস্কো একজন পুলিশ চিফকে ফরাসিতে কথাটা বললেন, পুলিশ চিফের মুখ বেজায় গোমড়া। বুঝলাম বিদেশির নাক গলানোতে খচে গেছেন। তাঁর নির্দেশে দুজন পুলিশ লাশ চিত করে শোওয়াল।

কর্নেল মৃত পেদ্রোর জিনসের প্যান্ট তল্লাশ করে উঠে দাঁড়ালেন। ঘরে উজ্জ্বল আলো, তবু কর্নেল মেঝের কার্পেটে টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে বিছানার কাছে ঝুঁকে পড়লেন। কী একটা তুলে নিয়ে পেদ্রোর লাশের কাছে গেলেন। পেদ্রোর ডান হাতের আঙুল আতস কাচে পরীক্ষা করে সটান উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমার কাজ শেষ। ডঃ ভাস্কো! আমরা বাংলোয় ফিরে যাব।

বাংলোয় ফেরার পথে কর্নেল বললেন, ডঃ ভাস্কো, আপনি ফিরে গিয়ে মাছধরা ট্রলারের মালিক আইউংয়ের সঙ্গে কথা বলুন। আমরা আজ রাতেই কোকো দ্বীপের দিকে পাড়ি জমাতে চাই। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। পেদ্রোর খুনি কোকোর দিকে এতক্ষণ রওনা হয়ে গেছে। সব কথা যথাসময়ে খুলে বলব।

ডঃ ভাস্কো চিন্তিত মুখে বললেন, কিন্তু আমার সহকারী পিটার গিলম্যান যে হাওয়াই দ্বীপের হনলুলুতে দুসপ্তাহের ছুটি কাটাতে গেছে। কাল সকালের প্লেনে সে ফিরবে। তাকে সঙ্গে না নিয়ে

কর্নেল তার কথার ওপর বললেন, তাঁকে দরকার হবে না।

হালদারমশাই এতক্ষণ উসখুস করছিলেন। নিজস্ব ভাষায় বললেন, কর্নেলসার, ওনারে কইয়া আমারে একখান রিভলভার দেওনের ব্যবস্থা করতে পারেন না?

পাখিরা ভয় পেল কেন?| রাত বারোটায় মৎস্যবন্দর হোয়ালাহা থেকে গোপনে চিনা জেলে আইউংয়ের ট্রলারে আমরা পাড়ি জমিয়েছিলাম। পেদ্রো গার্সিয়ার খুনি ভয়ঙ্কর দ্বীপ কোকোর দিকে কোন আক্কেলে ছুটে যাবে বুঝতে পারছিলাম না। সেখানে নাকি সাংঘাতিক হিংস্র ঘোড়া-মুখো মানুষের ডেরা! আমার বৃদ্ধ বন্ধু তখনও মৌনীবাবা। মুখে চুরুট। চোখ বন্ধ। সাদা দাড়িতে একটুকরো ছাই।

আইউংয়ের মাছধরা ট্রলারের নিচের খোলটা মাছের গুদাম। ওপরে এঞ্জিনঘর সংলগ্ন একটা কেবিন। দুপাশে রেলিংয়ের খোলা ডেক। আমাদের দলে দুজন সশস্ত্র রক্ষী কোয়া এবং তিকি। তারা তাহিতির আদিবাসিন্দাদের বংশধর। প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই এঞ্জিনঘরে উঁকি মেরে সম্ভবত ট্রলার চালানো দেখছিলেন। চালকের নাম চিচিন। সে বুড়ো জেলে আইউংয়ের ছেলে। বাবা-ছেলে মাত্র দুজনে মিলে প্রশান্ত মহাসাগরে মাছ ধরে বেড়ায়। তাদের সাহস আছে

বটে!

কেবিনটা ছোট্ট। দুধারে দুটো শোওয়ার বাঙ্ক। মধ্যিখানে একটা ডাইনিং টেবিল। টেবিলে ম্যাপ বিছিয়ে কর্নেল এবং ডঃ ভাস্কো কোকো দ্বীপের অবস্থান দেখছিলেন। ডঃ ভাস্কো বললেন, দ্বীপের এই ম্যাপটা রাষ্ট্রপুঞ্জের লোকেরা হেলিকপ্টার থেকে দেখে তৈরি করেছিলেন। দ্বীপের গড়ন লক্ষ করুন। প্রায় একফালি চঁাদের মতো। ইংরেজিতে ক্রেসেন্ট বলা চলে। তো পলিনেশীয় অঞ্চলের ভাষায় চন্দ্রকলাকে বলে কোকো। মোটামুটি দৈর্ঘ্য তিন মাইল। মাঝখানে চওড়া অংশ মাত্র এক মাইল। পিঠের দিকটা খাড়া পাথুরে পাহাড়। উলটো দিকটা ঢালু এবং অজস্র খাড়ি আছে। এই জায়গাটুকু বালির বিচ। আমরা বিচ দিয়ে দ্বীপে পৌঁছেছিলাম।

কর্নেল বললেন, মনে হচ্ছে বিচের উত্তর অংশে ঘাস আর ফুলের জঙ্গলে প্যাঁচা-প্রজাপতির ঝাঁক দেখেছিলাম।

ডঃ ভাস্কো বললেন, এখন ওদিকটায় দুর্ভেদ্য জঙ্গল। আমরা ক্যাম্প করেছিলাম বিচের ওপরে এইখানে। কিছুটা জঙ্গল সাফ করতে হয়েছিল।

কর্নেল আইউংকে বললেন, ভাই আইউং! আপনার ট্রলার কতক্ষণে পৌঁছতে পারবে?

আমুদে বুড়ো জেলে কুতকুতে চোখে হেসে বলল, ঘন্টাতিনেক লেগে যাবে। আমরা সাপের লেজ ধরে এগোচ্ছি। মুরিয়া, রাইয়াতিয়া, তারপর বোরাবোরা দ্বীপের পাশ কাটিয়ে সাপ ব্যাটাচ্ছেলে দৌড়চ্ছে কোকোর বুক ঘেঁষে।

ডঃ ভাস্কো একটু হাসলেন। সাপ বলতে ও সমুদ্রস্রোতের কথা বলছে।

আইউং বলল, লেজ ছাড়লেই কিন্তু বিপদ। তবে ভাববেন না। চিচিনের মুঠোর জোর প্রচণ্ড।

কর্নেল বললেন, আপনি কি কখনও কোকোর কাছাকাছি মাছ ধরেছেন?

ওখানে হাঙরগুলো রাক্ষুসে।

কখন হালদারমশাই আমাদের কাছে এসেছেন, লক্ষ করিনি। বলে উঠলেন, হাঙর ভেলা উলটে দেবে না তো?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, দিতেও পারে। তখন সাঁতার দিতে হবে কিন্তু।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক সহাস্যে মাতৃভাষায় বলে উঠলেন, রিভলভার পাইছি। গুলি করুম। আর কারে ডর? তবে ভেলা উলটাইলে সাঁতারের কথা কইলেন। কর্নেলসার, আমি জলপোকা।

কর্নেল আইউংকে বললেন, আচ্ছা ভাই আইউং, কোকো দ্বীপের ঘোড়া-মুখো মানুষ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

আমুদে আইউংয়ের মুখ সঙ্গে-সঙ্গে কেমন যেন পাংশু হয়ে গেল। চাপা স্বরে বলল, আমার ছেলে চিচিন একদিন দূরবিনে একপলকের জন্য ভয়ঙ্কর জন্তুটাকে দেখতে পেয়েছিল। তারপর থেকে আমারা কোকো দ্বীপ এড়িয়ে চলি। তবে এই যে আপনাদের পৌঁছে দিতে কোকো দ্বীপের কাছে যাচ্ছি, সেটা মাননীয় আলবের্তো ভাস্কোমশাইয়ের খাতিরে। ওঁর সাহায্য ছাড়া তাহিতিতে আমি রাজনৈতিক আশ্রয় পেতাম না। আমি ওঁর কাছে ঋণী।

কোকো দ্বীপে আপনি বা চিচিন সন্দেহজনক আর কিছু কখনও লক্ষ করেছেন কি?

আইউং একটু চুপ করে থেকে বলল, দ্বীপটা সত্যিই ভূতুড়ে। কমাস আগে একরাত্রে ওখানে একটা আলো দেখেছিলাম। আলোটা কিছুক্ষণ নড়াচড়া করে নিভে গেল।

ডেকে প্রচণ্ড হাওয়া আর জলের ঝাপটানি। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলো ফুটেছে। কিন্তু গাঢ় কুয়াশার সঙ্গে জ্যোৎস্না মিশে সবকিছু অস্পষ্ট। ট্রলারের আলোর ছটায় কালো জলের আলোড়ন দেখা যাচ্ছে। আইউং এঞ্জিনঘরে গিয়ে কম্পাসের ওপর ঝুঁকে ছেলেকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে ডঃ ভাস্কো ডেকে গেলেন। তিনি রক্ষিদ্বয় কোয়া এবং তিকির সাহায্যে রবারের ভেলা পাম্প করে ফুলিয়ে তাতে জিনিসপত্র বোঝাই করতে ব্যস্ত হলেন। দেখলাম ভেলায় দুটো করে ছোট্ট বৈঠা আটকানো আছে। হালদারমশাই তাঁর বাইনোকুলার নিয়ে ডেকে পা বাড়িয়েই পিছিয়ে এলেন। কর্নেল ডেকের রেলিংয়ে ভর দিয়ে বাইনোকুলারে সমুদ্র দর্শন করতে থাকলেন। হালদারমশাই বাঁকা মুখে বললেন, গা গুলোচ্ছে। কী বিচ্ছিরি গন্ধ! বাথরুম কই?

দেখিয়ে দিতেই গোয়েন্দপ্রবর সবেগে ঢুকে গেলেন। সমুদ্রে ভাসলে সি সিকনেস হয় তাই আমাকে এবং ওঁকে কর্নেল ওষুধ খাইয়েছিলেন। বুঝলাম, হালদারমশাইয়ের ওষুধ খাওয়া ব্যর্থ হয়েছে। ঢেউয়ের নাগরদোলায় এই রোগটার প্রাদুর্ভাব ঘটে। মানুষকে কাহিল করে ছাড়ে। আমারও অবশ্য বমিভাব আসছিল। কিন্তু তার চেয়ে কাবু করেছিল মাথার যন্ত্রণা। বেগতিক দেখে অ্যাসপিরিনের বড়ি গিলব ভাবছি, সেই সময় ডঃ ভাস্কো কেবিনে ঢুকলেন। আমার হাতে অ্যাসপিরিনের বড়ি দেখে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হবে মিঃ চাউদ্রি। সহ্য করুন। আর আধঘন্টা পরে আমরা ডাঙায় পৌঁছে যাব। দেখবেন, মাথায় আর যন্ত্রণা হচ্ছে না।

হালদারমশাই করুণ মুখে বেরিয়ে এসে বাঙ্কে চিত হলেন। পরক্ষণেই বাঙ্ক থেকে গড়িয়ে পড়ে মাতৃভাষায় কিছু একটা গালমন্দ করে উঠলেন।

ডঃ ভাস্কো তাকে উঠতে সাহায্য করে বললেন, উপকূলের কাছাকাছি বলেই ঢেউটা বেশি। কর্নেলের ডাক ভেসে এল, ডঃ ভাস্কো, ডঃ ভাস্কো, ডঃ ভাস্কো!

ডঃ ভাস্কো কেবিনের দরজা দিয়ে ডেকে ফিরে গেলেন। আমি টলতে-টলতে দরজায় উঁকি দিলাম। সমুদ্রের গর্জন আর এঞ্জিনের শব্দে ওঁদের কথা শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু ওঁদের হাবভাব দেখে মনে হল দুজনেই উত্তেজিত। ততক্ষণে হালদারমশাই আবার বাথরুমে ঢুকেছেন।

কর্নেল এবং ডঃ ভাস্কো কেবিনে ফিরে এলেন একটু পরে। দেখলাম, কর্নেলের দাড়ি ভিজে একাকার। দাড়ি থেকে জল ঝেড়ে তুম্বো মুখে বললেন, তা হলে যা ভেবেছিলাম, তা-ই ঠিক হল ডঃ ভাস্কো!

ডঃ ভাস্কো উদ্বিগ্নমুখে বললেন, কিন্তু আপনার দেখতে ভুল হয়নি তো?

নাহ! আলোটা টর্চেরই।

কে এমন দুঃসাহসী যে কোকো দ্বীপে টর্চ জ্বেলে ঘুরে বেড়ায়?

সঙ্গে দলবল এবং অস্ত্রশস্ত্র থাকলে দুঃসাহসী হওয়া মানুষের স্বভাব, ডঃ ভাস্কো! কর্নেল চুরুট ধরালেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ফের বললেন, ওই বিচ দিয়ে দ্বীপে ওঠা উচিত হবে না। আইউংকে ডেকে পরামর্শ করা যাক।

ডঃ ভাস্কোর ডাকে আইউং এল এঞ্জিনঘর থেকে। কর্নেল সেই ম্যাপটা বের করে টেবিলে বিছিয়ে বললেন, ভাই আইউং, এই বিচ ছাড়া অন্য কোথাও কি কোকো দ্বীপে ওঠা যায় না?

আইউং বলল, বিচের উত্তরে একটা শাড়ি আছে। খাড়িটা বড়-বড় পাথরে ভর্তি। পাথরগুলো এড়িয়ে আপনাদের ভেলা যদি কিনারায় পৌঁছতে পারে, খানিকটা ঢালু জায়গা পাবেন। কিন্তু ঢালু জমিটা ঘন জঙ্গলে ঢাকা। তা ছাড়া পাশেই একটা ছোট্ট প্রপাত দেখেছি। প্রপাতের জল সমুদ্রে পড়ে হুলা-হুলা নাচছে। এই মুলুকেরই নাচ কিন্তু!

ডঃ ভাস্কো ম্যাপে আঙুল রেখে বললেন, এই সে প্রপাত। আসলে দ্বীপে একটা মিঠে জলের প্রস্রবণ আছে। সেটা সরু ঝরনার মতো নেমে এসেছে। আমরা জানুয়ারি মাসে গিয়ে সেখান থেকেই পানীয় জল আনতাম। তো এই খাড়ি দিয়ে পেঁৗছতে পারলে বরং ঝরনার ধারেই জঙ্গল কেটে ক্যাম্প করা যাবে। সেবার শুধু একটাই সমস্যা ছিল। নারকোলবনের ভেতর দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে জল আনতে হত। কারণ ক্রমাগত শুকনো নারকোল বোমার মতো মাথায় পড়ত। মাথায় হেলমেট পরে যেতেই হত। নইলে খুলি ফেটে মরার আশঙ্কা ছিল। আর সে কী বিচ্ছিরি ফট ফট শব্দ! জানেন কর্নেল সরকার?

পাথরে নারকোল পড়ে ফেটে যায়। সেই নারকোল-শাঁস খেতে আসে আঁকে-ঝকে রাক্ষুসে সামুদ্রিক কাঁকড়া, সে-ও আর এক উপদ্রব!

আইউং প্রায় নেচে উঠল। বাহ, আমারও আপনাদের সঙ্গী হতে ইচ্ছে করছে। ওই কঁকড়ার নাম নারকোল-কাঁকড়া। খুব সুস্বাদু! এক বস্তা ধরতে পারলে রাজা হয়ে যাব। তবে বেজায় ধূর্ত ব্যাটাচ্ছেলেরা! দেখি, চিচিনের সঙ্গে পরামর্শ করে আসি।

বুড়ো এঞ্জিনঘরে চলে গেল। হালদারমশাই ততক্ষণে বাথরুম থেকে বেরিয়ে মেঝেয় কম্বল পেতে চিত হয়েছেন। তাঁর শোচনীয় অবস্থা দেখে ডঃ ভাস্কো তাকে ওষুধ খাইয়ে দিলেন।

কর্নেল ম্যাপের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। আইউং ফিরে এসে বলল, চিচিন রাজি হচ্ছিল না। ওকে অনেক বুঝিয়ে একটা শর্তে রাজি করালাম। বললাম, সরকারি বড়কর্তারা এবং সশস্ত্র রক্ষী আছে। সাংঘাতিক জন্তুটাকে মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে। তো ওই খাড়িতে ট্রলার ঢোকানো যাবে না। পাশের একটা খাড়িতে চিচিন ট্রলার নোঙর করে রাখবে। কিন্তু চিচিনের একটা রাইফেল আর ডজনচারেক গুলি দরকার। এই হল ওর শর্ত।

ডঃ ভাস্কো বললেন, এখনই দিচ্ছি। আমরা অনেক অস্ত্র এনেছি।

আবার প্রোগ্রাম বদলানোর দরুন আধঘন্টা দেরি হল। ট্রলারের এঞ্জিন যখন বন্ধ হল এবং ঘড়ঘড় শব্দে নোঙর পড়ল, তখন রাত সাড়ে তিনটে বাজে। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে রবারের দুলন্ত ভেলায় নামা এক বিপজ্জনক কসরত। অবাক হয়ে দেখলাম, সি-সিকনেস-এ কাহিল হালদারমশাই অক্লেশে ভেলায় অবতরণ করলেন। পুলিশ-ট্রেনিং সম্ভবত এর কারণ। তারপর বৈঠা টানতেও তিনি দক্ষ। তার কারণ সম্ভবত তার অতীত জীবন, যা নদ-নদীর দেশ পূর্ববঙ্গে কেটেছে।

আইউং নিজের পেলিনেশীয় ক্যাননা নামিয়েছিল। ছিপনৌকোর গড়ন সেই ক্যানোতে মাছধরা জাল ছিল। বড়-বড় পাথর এড়িয়ে ঢেউয়ের নাগরদোলায় কীভাবে কিনারায় পৌঁছেছিলাম, বলতে পারব না। আমি সারাক্ষণ চোখ বন্ধ করেছিলাম। লোনা জলে পোশাক ভিজে জবুথবু অবস্থা। হালদারমশাইকে বলতে শুনলাম, হাঙর গেল কই? বুড়া কইছিল হাঙর আছে। হঃ!

তারপরই যেন একটা হুলস্থুল বেধে গেল। সমুদ্র আর প্রপাতের গর্জন ছাপিয়ে হঠাৎ হাজার-হাজার সামুদ্রিক পাখির চিৎকার শুরু হল। আবছা জ্যোৎস্নায় তাদের ওড়াউড়ি দেখতে পেলাম। আইউং ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠল, ওরা তো এখন ঘুমিয়ে থাকে। কেন ওরা জেগে উঠল? মশাইরা, সাবধান

হোন! সাংঘাতিক দালোটা নিশ্চয় আমাদের সাড়া পেয়েছে। আমি শুনেছি, সে যেখানে যায়, সেখানকার ঘুমন্ত পাখিরা ভয় পেয়ে পালাতে থাকে।

ডঃ ভাস্কো ব্যস্তভাবে বললেন, কোয়া! তিমি! হ্যান্ডগ্রেনেড হাতে নাও।

কর্নেল খাড়ির দিকে ঘুরে পাখিদের ওড়াউড়ি দেখছিলেন। বললেন, আশ্চর্য তো! হঠাৎ ভয় পেল কেন ওরা? পাখিগুলো সি-গাল। সারারাত ওরা ঘুমিয়ে থাকে।

ফিকে জ্যোৎস্নায় লক্ষ করলাম, পাখির ঝাঁক। খাড়ি থেকে দ্বীপের ওপর কিছু অংশ জুড়ে চক্কর দিচ্ছে, হাজার-হাজার পাখি মিলে যেন একটা বিশাল কালো চাকা অদ্ভুত শব্দে ঘুরপাক খাচ্ছে।

কর্নেলের পাল্লায় পড়ে জীবনে অনেক বিপজ্জনক অবস্থায় কাটিয়েছি, যখন সব সাহস উবে গিয়ে আতঙ্কে রক্ত ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে। কিন্তু কোকো দ্বীপে পা দিয়েই যে আতঙ্কের মধ্যে কিছু সময় কাটিয়েছিলাম, জীবনে তা ভুলব না।

আমরা কর্নেলের নির্দেশে গুঁড়ি মেরে বসে পড়লাম। উনি টর্চ জ্বালতে নিষেধ করেছিলেন। আমরা আছি ঢালু জমির নিচে এবং ওপরে ঘন ঝোপঝাড়। কোয়া এবং তিকির এক হাতে দুর্ধর্ষ কালাশকিভ রাইফেল, অন্য হাতে গ্রেনেড। তারা আমাদের সামনে একটা পাথরের দুপাশে হাঁটু দুমড়ে বসেছে। প্রতি মুহূর্তে ঘোড়া-মুখো দানবটার আবির্ভাব আশঙ্কা করছিলাম।

কতক্ষণ পরে কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সি-গালগুলো চুপ করেছে। ওরা ডেরায় ফিরে গেছে কিন্তু আমাদের আপাতত এখানেই অপেক্ষা করা উচিত। ভোরের আলো ফুটলে আমরা রওনা হব। তবে সত্যিই এ একটা রহস্যময় ঘটনা। হঠাৎ ওরা ভয় পেল কেন?

রহস্যের বেড়াজালে | দিনের আলো সত্যিই মানুষকে হারানো সাহস ফিরিয়ে দেয়। হাতিঘাস, ফার্ন, রঙিন পাতাওয়ালা মানকচুজাতীয় গাছের ঝোপ, বুগেনভিলিয়া আর রংবেরঙের নাম-না-জানা ফুলের জঙ্গল পেরিয়ে সেই ঝরনাধারার পাশে আমাদের দুটো ক্যাম্প পাতা হয়েছিল। উত্তরে ছটফটিয়ে চলা ঝরনাধারার ওপারে এবং ক্যাম্পের পশ্চিমে নিবিড় নারকোলবন। সামনে দক্ষিণে রবারগাছের জঙ্গল। ব্রেকফাস্ট করে কর্নেল এবং ডঃ ভাস্কো গার্ড তিকিকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন। এঁদের হাতে প্রজাপতিধরা জাল দেখে বুঝলাম, প্যাঁচা প্রজাপতির খোঁজে যাচ্ছেন।

কর্নেল আমাকে এবং হালদারমশাইকে ক্যাম্প ছেড়ে যেতে নিষেধ করেছিলেন। না করলেও অন্তত আমি এক পা বাড়াতে রাজি নই। আইউং কিছুক্ষণ দোনামনা করার পর একটা সাঁড়াশি এবং বস্তা হাতে নারকোলবনের দিকে চলল। ওর পিঠে গোঁজা লম্বাটে একটা দা। কোয়া তাহিতি ভাষায় ওকে কিছু বলল। কিন্তু আইউং যেন নারকোলখেকো কাঁকড়ার নেশায় আচ্ছন্ন। কোয়ার কথা গ্রাহ্য করল না।

হালদারমশাই বাইনোকুলারে চারদিক দেখছিলেন। হঠাৎ বললেন, ওগুলি কী ফল? বাতাবি লেবু নাকি? বলেই কোয়াকে জিজ্ঞেস করেলেন, হোয়াট ইজ দ্যাট ফুট! বিগ ট্রি অ্যান্ড বিগ ফুট!

কোয়া জিভে একটা শব্দ করে বলল, ব্রেডফুট! ডেলিশাস মিস্টার!

কয় কী জয়ন্তবাবু? রুটিফল? গাছে রুটি ধরে নাকি? রূপকথায় যা শুনেছিলাম, তা দেখি সত্যি। সেই যে একটা রাখাল পিঠে পুঁতেছিল। তা থেকে পিঠেগাছ হল। পড়েননি?

বললাম, পড়েছি। তারপর এক রাক্ষসী বুড়ি সেজে এসে পিঠে চাইল। রাখাল যেই তার হাতে পিঠে দিয়েছে, বুড়ি তাকে খপ করে ধরে ঝুলিতে পুরেছে। কাজেই সাবধান!

হালদারমশাই খি খি করে একচোট হাসলেন। তারপর ফের বাইনেকুলারে রবারগাছের জঙ্গলের পাশে ব্রেডফুট গাছটা দেখতে লাগলেন। একটু পরে দেখি, উনি বাইনোকুলার নামিয়ে পকেট থেকে রিভলভার বের করে এগিয়ে যাচ্ছেন। বললাম, হালদারমশাই, হালদারমশাই, কোথায় যাচ্ছেন?

একখান পিঠা না খাইয়া ছাড়ুম না!

যাবেন না। হয়গ্রীব ওত পেতে আছে।

কোয়া চেঁচিয়ে উঠল, ডোন্ট গো মিস্টার!

গোয়েন্দাপ্রবর কানে নিলেন না। লম্বা পায়ে এগিয়ে গেলেন। গাছটা অন্তত পঞ্চাশ মিটার দূরে। হঠাৎ ওঁকে একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়তে দেখলাম। তারপর গুড়ি মেরে রবারগাছের জঙ্গলে ঢুকললেন। উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, কোয়া, দেখো তো উনি কোথায় গেলেন।

কোয়া নির্বিকার মুখে বলল, আমি ক্যাম্প ছেড়ে নড়ব না। আমার চাকরি যাবে।

কী করব ভাবছি, সেইসময় ঝরনার দিক থেকে আইউং ছুটে এল। তার হাতে সেই ধারালো দা। ভয়ার্ত মুখে সে কোয়াকে কিছু বলল। কোয়া রাইফেল বাগিয়ে ঝরনার দিক করে দাঁড়াল। বললাম, কী হয়েছে মিঃ আইউং?

ঘোড়া-মুখো দানো! ঝরনার ওপারে ঝোপের ভেতর মুখ বের করে উকি দিচ্ছিল।

বলেন কী।

হ্যাঁ মশাই! আমি স্পষ্ট দেখেছি। চারটে কাঁকড়া ধরেছিলাম। বস্তা আর সাঁড়াশি ফেলে পালিয়ে এসেছি। আমি হালদারমশাইয়ের জন্য উদ্বিগ্ন। বললাম, কর্নেল এবং ডঃ ভাস্কো ফিরে আসুন। তারপর আপনার সাঁড়াশি ও বস্তা উদ্ধার করা যাবে। কিন্তু এদিকে এক কাণ্ড!

কোয়া তাহিতি ভাষায় ওকে কিছু বলল। আইউং আমার দিকে ঘুরে বলল, দানোটা ঝরনার ওপারে আছে। কাজেই আপনাদের সঙ্গী ভদ্রলোকের কোনও ভয় নেই। উনি হয়তো খরগোশ দেখেছেন। খরগোশের মাংস সুস্বাদু!

মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেলাম। রবারবনের কছে গিয়ে ডাকলাম, হালদারমশাই, হালদারমশাই!

কোনও সাড়া এল না। আরও কয়েকবার ডাকাডাকি করে ক্যাম্পে ফিরলাম। বরাবর দেখে আসছি, অত্যুৎসাহী এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ কেলেঙ্কারি না বাধিয়ে ছাড়েন না। কোয়া তার ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল, ইটিং ব্রেডফুট। শিওর!

বললাম, কিন্তু ডাকাডাকি করে কোনও সাড়া পেলাম না। হয় তো–

আমার কথার ওপর আইউং বলল, পাকা ব্রেডক্রুট খেলে ভীষণ ঘুম পায়।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল এবং ডঃ ভাস্কো ঝরনার দিক থেকে ফিরে এলেন। আইউং হাউমাউ করে ঘোড়া-মুখো দানোর খবর দিল এবং তার সাঁড়াশি-বস্তা উদ্ধারের জন্য কাকুতিমিনতি শুরু করল। ডঃ ভাস্কো বললেন, কোয়া, তুমি আইউংয়ের সঙ্গে গিয়ে ওর জিনিসগুলো উদ্ধার করো।

ইতিমধ্যে কর্নেলকে আমি হালদারমশাইয়ের দুঃসংবাদ দিয়েছি। কর্নেল ডঃ ভাস্কোকে ঘটনাটা জানিয়ে ব্যস্তভাবে বললেন, মিঃ হালদার সম্ভবত পেদ্রোর খুনি কিংবা তার দলের কাউকে অনুসরণ করেছেন। আমাদের এখনই ওঁর খোঁজে যেতে হবে।

ডঃ ভাস্কো ক্যাম্পে ঢুকে একটা রাইফেল নিয়ে এলেন। বললেন, তিকি তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। কোয়া এখনই ফিরে আসবে।

রবারগাছের জঙ্গল এমন নিবিড় আর দুর্ভেদ্য যে, কয়েকগজ এগিয়ে ডাইনে ব্রেডফুট গাছের জঙ্গলে ঢুকতে হল। কর্নেল বাইনোকুলারে গাছপালার ফাঁক দিয়ে কিছু দেখার পর বললেন, একটা পাথরের শৈলশিরা দেখতে পাচ্ছি। ওই শৈলশিরার নিচেই কি সমুদ্র?

ডঃ ভাস্কো সায় দিলেন। দ্বীপের শেষ সীমানা ওটা।

কর্নেল সতর্ক দৃষ্টিতে হালদারমশাইয়ের গতিবিধির সূত্র খুঁজতে খুঁজতে হাঁটছিলেন।-পাশে একটা নারকোল বনে অনবরত পটকা ফাটার শব্দে চমকে উঠেছিলাম। তারপর বুঝলাম, শুকনো নারকোল

খসে পড়ছে। এবার ফার্ন আর বুগেনভিলিয়ার জঙ্গল পেরিয়ে ঢালু হয়ে ওপরে ওঠা মোটামুটি ভোলামেলা বিস্তীর্ণ জায়গা। নানা গড়নের পাথর, ঘাস আর ফলের হাসিতে ঝলমলে ঝোপঝাড়। কর্নেল হঠাৎ একখানে থেমে বললেন, ওই দেখুন ডঃ ভাস্কো! প্যাঁচা প্রজাপতির আঁক!

ডঃ ভাস্কো আস্তে বললেন, হ্যাঁ।

ডঃ ভাস্কো, বুঝতে পেরেছি, আপনার মন প্রজাপতিতে নেই। আগেও ছিল না। তবে এবার পেদ্রোর খুনি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

উনি চমকে উঠে কর্নেলের দিকে তাকালেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

কর্নেল একটু হাসলেন।পেদ্রো গার্সিয়া একসময়ে ছিল তাহিতির জাঁ ব্লাক জাহাজ কোম্পানির নাবিক। সম্ভবত কারও হুমকিতে চাকরি ছেড়ে কলকাতা পালিয়েছিল। মা-আ-উ-আ ইন থেকে ফিরে গতরাত্রে আমি জাঁ ব্লক কোম্পানিতে ফোন করে এ-কথা জেনেছি। তার আগেই অবশ্য আমার একটু সন্দেহ জেগেছিল। বাংলোয় আপনার লেখা প্রজাপতির বইয়ে আপনার পুরো নাম দেখেছিলাম। ডঃ ভাস্কো বিরক্ত মুখে বললেন, গার্সিয়া একটা সাধারণ নাম। আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না!

পেদ্রো খুন হওয়ার খবর গতরাত্রে আপনিই যেচে পড়ে আমাকে দিয়েছিলেন। তার মানে, পেদ্রোর দিকে আপনার নজর ছিল। আমি খুব কৌতূহলী চরিত্রের লোক ডঃ গার্সিয়া! এখানে আসার আগে কোকো দ্বীপ সম্পর্কে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে গিয়ে পুরনো সামরিক নথিপত্র ঘেঁটেছিলাম। ১৭৬০ সালে পর্তুগিজ জলদস্যু ওভালদো দে মেলো দে গার্সিয়ার ঘাঁটি ছিল কোকো দ্বীপ। পরে জেনেছি, পেদ্রো গার্সিয়া ছিল তার বংশধর। জাঁ ব্লাক কোম্পানিতে ফোন করে এ-ও জেনেছি আপনারই সুপারিশে পেদ্রোর চাকরি হয়েছিল। কিন্তু সম্ভবত সে কারও হুমকি চাকরি ছেড়ে পালায়।

এক কথা বারবার শুনতে চাইনে। আপনার বক্তব্য কী?

আপনি বাঙ্গালোর সম্মেলন থেকে কলকাতা হয়ে ফেরার সময় পেদ্রোর সঙ্গে রিপন লেনে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সতর্কতার দরুন আপনি কাছেই ইলিয়ট রোডে আমার সঙ্গে দেখা করেন। যাই হোক, পেদ্রো আপনার কথায় আবার তাহিতি এসেছিল। তারপর সম্ভবত সে টের পায় আপনি তাকে ফাঁদে ফেলেছেন। কলকাতার পাসপোর্ট অফিসে মিঃ হালদার তাকে আমার কীর্তিকলাপ জানিয়েছিলেন। তাই সে আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে সাহস পায়নি, তার কারণ অনুমান করা যায়। ফোনে আপনার আড়িপাতার ভয় ছিল পেদ্রোর।

ডঃ ভাস্কো কুঁসে উঠলেন, কিন্তু আমি ওকে খুন করিনি।

কর্নেল চুরুট জ্বেলে বললেন, না হয় আপনি ওকে খুন করেননি। তবে পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের ম্যাপ হাতাতে দরকার হলে তা করতেন আপনি। আপনার দুর্ভাগ্য। তার আগেই আপনার প্রতিপক্ষ পেদ্রোকে খতম করে ম্যাপ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। পেদ্রোর সঙ্গে আপনার রক্তের সম্পর্ক ছিল ডঃ গার্সিয়া!

প্রমাণ দিতে পারেন?

পারি। নিহত পেদ্রোর পকেট থেকে পকেটমারদের কৌশলে এই চিঠিটা আমি হাতিয়েছিলাম। চিঠিটা পর্তুগিজ ভাষায় লেখা। পর্তুগিজ ভাষা রোমান হরফে লেখা হয়। তবে আপনার দফতরের বাংলোর পরিচারক হুয়া পর্তুগিজ জানে। সে আমাকে সাহায্য করেছে। এটা আপনার লেখা চিঠি। বলে কর্নেল ওঁকে চিঠিটা দিলেন।

ডঃ ভাস্কো চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে বললেন, ঈশ্বরের দোহাই কর্নেল সরকার। আর এসব কথা নয়। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনাকে আমি...

কর্নেল তার কথার ওপর বললেন, গুপ্তধনের ভাগ দেবেন তো? গুপ্তধনে আমার মাথাব্যথা নেই ডঃ গার্সিয়া! আমি সাংঘাতিক ঘোড়া-মুখো মানুষ সম্পর্কেই আগ্রহী!

এতক্ষণে বললাম, কর্নেল আপনি হালদারমশাইয়ের কথা ভুলে গেছেন। তিনি হয়তো বিপন্ন।

কর্নেল হাসলেন। না ডার্লিং, বাইনোকুলারে দেখে নিয়েছি হালদারমশাই ওই শৈলশিরার নিচে একটা পাথরের আড়ালে ঘাপটি পেতে বসে আছেন! বলে তিনি ডঃ ভাস্কোর দিকে ঘুরলেন। হিংস্র দানবটির ভয়ে আপনি আর কোকো দ্বীপে আসার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। তা ছাড়া এই বিতর্কিত দ্বীপে বরবার আসতে দেওয়ার অনুমতি তাহিতি সরকার দিতে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রকৃতি পরিবেশবিজ্ঞানী মহলে সুপরিচিত এই কর্নেল নীলাদ্রি সরকার আপনার আবার কোকো দ্বীপে আসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তবে সতর্কতার জন্য আপনি পেদ্রোকে কি আমার ছায়া না মাড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন?

ডঃ ভাস্কো গলার ভেতর থেকে বললেন, হ্যাঁ।

নিহত পেদ্রোর আঙুলে এবং খাটের নিচে আতসকাচে আমি জীর্ণ প্রাচীন কাগজের আঁশ দেখেছি। ওটাই সম্ভবত গুপ্তধনের ম্যাপ। কিন্তু আপনি শুনলে দুঃখিত হবেন ডঃ গার্সিয়া, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে সামরিক নথিপত্রে দেখেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা কোকো দ্বীপে সামরিক ঘাঁটি গড়ার সময় ডিনামাইটে ওই শৈলশিরার একটা অংশ ধসিয়েছিল। ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থার সূত্রে খবর পাওয়া যায়, জাপানিরা সেখানে প্রচুর সোনাদানা, হিরে, জহরত আবিষ্কার করে।

ডঃ ভাস্কো প্রায় আর্তনাদ করলেন, হায় ঈশ্বর!

এই সময় তিকি বলে উঠল, কর্নেল সরকারের সঙ্গী ভদ্রলোক পালিয়ে আসছেন।

দেখলাম, প্রাইভেট ডিটেকটিভ ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদের দিকে দৌড়ে আসছেন। আমাদের দেখতে পেয়ে ওঁর গতি বেড়ে গেল। কাছে এসে হাঁসফাঁস করে বলেন, পলাইয়া যান, পলাইয়া যান। হয়গ্রীব ইজ কামিং!

কর্নেল কিছু বলার আগেই উনি পাশ কাটিয়ে গিয়ে পেছনে একটা নারকোল গাছে তরতর করে উঠে গেলেন। আমরা দৌড়ে গেলাম। কর্নেল বললেন, মাথায় নারকোল পড়বে হালদারমশাই! খুলি ফেটে যাবে।

তখনই একটা নারকোল নিচের পাথরে পড়ে ফটাস শব্দে ফেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দপ্রবর নেমে এলেন। ডঃ ভাস্কোকে উত্তেজিতভাবে ইংরেজিতে বললেন, এ কী রিভলভার মশাই! দুনম্বরি জিনিস! ট্রিগার টেনে গুলি বেরোল না!

কর্নেল বাংলায় বললেন, ডঃ ভাস্কো আমাদের তিনজনকে তিনটে খেলনা রিভলভার দিয়েছেন হালদারমশাই!

ক্যান?

উনি চাননি আমরা আত্মরক্ষা করতে পারি।

ক্যান? ক্যান?

গুপ্তধনের অভিযাত্রীদের এই স্বভাব। তবে পরে বুঝিয়ে বলব। বলে কর্নেল ডঃ ভাস্কোর হাত ধরে টানলেন। দুঃখ করে লাভ নেই ডঃ গার্সিয়া! এবার পেদ্রোর খুনি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের একটি বিহিত না করে দ্বীপ থেকে চলে যাওয়া উচিত হবে না। সেইসঙ্গে ঘোড়া-মুখো মানুষটাকে পাকড়াও করা দরকার। চলুন। আপাতত ক্যাম্পে ফেরা যাক।

কিন্তু ক্যাম্পে ফিরে হকচকিয়ে গেলাম। দুটো ক্যাম্প মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। জিনিসপত্র চারদিকে ছড়ানো। ভাঙচুর অবস্থা। কোয়া এবং আইউংয়ের কোনও পাত্তা নেই।

হয়গ্রীবের মুখোমুখি| ডঃ ভাস্কোকে এখন কাকতাড়ুয়া দেখাচ্ছিল। ভাঙা গলায় অতিকষ্টে বললেন, আমাদের এখনই দ্বীপ ছেড়ে পালাতে হবে। সাংঘাতিক জন্তুটা কোয়া এবং আইউং বেচারাকে নিশ্চয় মেরে ফেলেছে। এ আমারই পাপের ফল!

তিনি হতাশ মুখে বলল, আমাদের ভেলা দুটো ছিঁড়ে ফেলেছে। আইউংখুড়োর ক্যানোটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আমরা চিচিনের ট্রলারে ফিরব কী করে? হায়! হায়! এবার বেঘোরে প্রাণটা যাবে! শুনেছি, ঘোড়া-মুখো দানোটার গায়ে গুলি বেঁধে না?

কর্নেল বাইনোকুলারে ঝরনার দিকটা দেখছিলেন। বললেন, আচ্ছা হালদারমশাই, হয়গ্রীবকে আপনি কোথায় দেখেছিলেন?

হালদারমশাই উত্তেজনার উপশমে নস্যি নিচ্ছিলেন। বললেন, একটা লোক উঁকি দিচ্ছিল দেখে তাকে ফলো করে যাচ্ছিলাম। ওদিকে পাহাড়ের একটা চাতালে হঠাৎ দেখি হয়গ্রীব। রিভলভারে গুলি বেরোল না। কী করব? পালিয়ে এলাম। আমাকে দেখে বিকট চিঁহি করে দাঁত খিচিয়ে তেড়ে আসছিল।

কর্নেল বললেন, একটা খটকা লাগছে। ক্যাম্প থেকে ওই শৈলশিরার দূরত্ব সিধে অন্তত দু মাইল। কাজেই এই ক্যাম্পে জন্তুটা হামা দিয়ে অতদূর পৌঁছতে হলে তার ডানা থাকা দরকার। হালদারমশাই! জন্তুটা দেখতে কেমন?

ভয়পাওয়া গলায় গোয়েন্দাপ্রবর বললেন, ধড় গোরিলার মতো। মুখ ঘোড়ার মতো। কালো কুচকুচে রং। লোমে ভর্তি।

ডঃ ভাস্কো এবং তিকি ক্যাম্প টেনে সরাচ্ছিলেন। ডঃ ভাস্কো বললেন, সর্বনাশ! রেডিয়ো ট্রান্সমিটারটা আছড়ে ভেঙেছে। খাবারের প্যাকেট বোঝাই পেটি দুটো দেখছি না। এ কী! অস্ত্রের বাক্সটাও নেই। এ কখনও জন্তুটার কাজ নয়।

নাহ। বলে কর্নেল হঠাৎ ঝরনার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর হাঁক দিলেন, মিঃ আইউং, ভয় নেই। গাছ থেকে নেমে আসুন।

দেখলাম, ঝরনার ধারে একটা ঝাকড়া গাছ থেকে আইউং নেমে এল। আমি এবং হালদারমশাই দৌড়ে গেলাম। আইউং বেজারমুখে বলল, ছ্যা ছ্যা, কোয়া এত ভীতু জানতাম না! হঠাৎ আমাকে ফেলে পালিয়ে গেল। আমি ভাবলুম, ও দানোটাকে দেখেছে। তাই গাছে উঠে প্রাণ বাঁচালাম। তারপর তার চোখ গেল ক্যাম্পের দিকে। দানোটা তা হলে সত্যিই হানা দিয়েছিল ক্যাম্পে। সর্বনাশ! আমার ক্যানোটাকে ব্যাটা আস্ত রাখেনি দেখছি!

কর্নেল বললেন, আপনি ক্যাম্পের দিকে তাকাননি? কোনও শব্দ পাননি?

নাহ্। ভয়ে চোখ বুজে ছিলাম। আর ঝরনার যা বিচ্ছিরি শব্দ! কিছু শোনা যায় না!

কর্নেল ক্যাম্পের কাছে ফিরে এসে বললেন, ডঃ ভাস্কো! ক্যাম্প দুটো খাটাতে হবে। খাদ্যের অভাব হবে না। দ্বীপে নারকোল আর ব্রেডফ্রুট আছে। ঝরনার জলে মাছের অভাব হবে না। নারকোল-খেকো কাঁকড়াও আছে। কী বলুন ভাই আইউং?

আইউং দোনামনা করে সায় দিল। কিন্তু ডঃ ভাস্কো রুষ্ট হয়ে বললেন, আপনারা থাকুন। আমরা আর এক মুহূর্ত এখানে থাকছি না। কোয়া নিশ্চয় হিংস্র জন্তুটার পাল্লায় পড়েছে। আবার আমাকে সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। চলো তিকি, আইউং এসো।

আইউং বেজার মুখে বলল, কিন্তু যাবেন কী করে কর্তা? ওদিকের খাড়িতে চিচিন আমাদের জন্য ট্রলার নিয়ে অপেক্ষা করছে। ট্রলারে পেঁৗছতে হলে সাঁতার কাটতে হবে। জলে নামলেই হাঙর গিলে খাবে যে!

এইসময় তিকি তাহিতি ভাষায় ডঃ ভাস্কোকে কিছু বলল। শুনেই উনি চমকে উঠলেন। আইউংয়ের মুখেও বিস্ময় লক্ষ করলাম। তারপর ফোঁস শব্দে শ্বাস ফেলে ডঃ ভাস্কো বললেন, ঠিক আছে কর্নেল সরকার! আমরা থাকছি।

কর্নেল হাসলেন, কোয়ার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেওয়ার জন্য আপনার থাকা দরকার।

বললাম, তার মানে?

মানে যথাসময়ে বুঝবে ডার্লিং! কর্নেল ক্যাম্পের তেরপলে হাত লাগালেন। এসো তোমরাও হাত লাগাও!

ক্যাম্প দুটো খাটানো হল। তিকি আইউংয়ের সঙ্গে গিয়ে ওর থলে এবং সাঁড়াশি নিয়ে এল। অনেক নারকোল আর কাঁকড়া ছিল থলেয়। খুশি হয়ে দেখলাম, ওরা এককাদি কলাও এনেছে। ঝরনার ধারে একটা কলাবনের খবর পাওয়া গেল। কর্নেল বললেন, পলিনেশিয়ার সব দ্বীপে অজস্র কলাগাছ আছে। আমরা এগুলোকে বলি সিঙ্গাপুরি কলা। আসলে এ-সবই প্রকৃতির দান।

ডঃ ভাস্কো কর্নেলের কাছে ক্ষমা চেয়ে আমাদের রিভলভার তিনটে ফেরত নিলেন। তিনটেই খেলনা মাত্র। ভাবতে বুক কেঁপে উঠল, হয়গ্রীবের কথা আলাদা—কিন্তু পেদ্রোর খুনির দলের হাত থেকে খেলনা অস্ত্র দিয়ে কি আত্মরক্ষাও করা যেত?

এবার ডঃ ভাস্কোর সত্যিকার রিভলভার কর্নেলের পাতলুনের পকেটে ঢুকল। তিকির কোমরে বেল্টে আটকানো হ্যান্ডগ্রেনেড ভর্তি ছোট্ট হ্যাভারস্যাক। সে তার রাইফেলটা আমাকে দিতে এলে হালদারমশাই

ছিনিয়ে নিলেন। জয়ন্তবাবুর কাম না। আমি চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। মিঃ টিকি, গিভ মি ওয়ান এক্সট্রা বুলেটকেস।

অগত্যা কর্নেলের পরামর্শে আইউং তার দা দিয়ে একটা গাছের ডাল কেটে লাঠি বানাল। সেটা আমাকে দিয়ে আমুদে লোকটি বলল, নাকে ঘা মারলে সব পালোয়ান জব্দ। এ আমাদের চিনা প্রবাদ কর্তা!

কাঁকড়ার রোস্ট, রুটিফল, নারকোলের শাঁস আর কলা দিয়ে সুস্বাদু লাঞ্চ খাওয়ার পর কর্নেল বললেন, আমরা ঝরনার ধার দিয়ে শৈলশিরার দিকে যাব। আমার ধারণা, প্রতিপক্ষ প্রস্রবণের কাছাকাছি কোথাও আছে। কারণ, ওখানেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা ঘাঁটি করেছিল।

ক্যাম্প-লুঠেরারা ভাগ্যিস টর্চগুলো নিয়ে যায়নি। আসলে প্রত্যেকের টর্চ ছিল ক্যাম্পখাটে বিছানার তলায়। ওরা বিছানা খাটসুষ্ঠু উলটে ফেলেছে। টর্চগুলো বিছানার তলায় চাপা পড়েছিল।

নারকোলবনগুলো এড়িয়ে ফার্ন আর ফুলেঢাকা ঝোপের আড়াল দিয়ে আমরা সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। একখানে আইউং একটা সাপকে দু টুকরো করল। এবার প্রতিমুহূর্তে সাপের আতঙ্ক। কোথাও কোথাও ঘাসে ঢাকা খোলা জমি আর পাথর। সেখানে আমরা পাথরের আড়ালে খুঁড়ি মেরে এগোচ্ছিলাম। তারপর চড়াই শুরু হল। বাঁ পাশে ঝরনাধারার ছলছল শব্দ। উঁচু গাছের অরণ্যের ঢুকে কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, একে বলে রেনফরেস্ট।

প্রতিটি গাছ থেকে ঘন লতাপাতার ঝালর নেমে এসেছে। আইউং দা দিয়ে সাবধানে ঝালরগুলো কেটে পথ করে দিচ্ছিল। আবছা আঁধার। কিন্তু কর্নেল টর্চ জ্বালতে নিষেধ করেছেন। সাপের আতঙ্কে লতা দেখলেই শিউরে উঠছিলাম। একবার আঁতকে উঠে লাঠির ঘা মেরে একটা লতাকে ছেরে দিলাম।

সামনে খোলা পাথুরে জমি দেখা গেল। কর্নেলের ইশারায় আমরা থমকে দাঁড়ালাম। বাঁ দিকে পাথরের একটা প্রকাণ্ড প্রাকৃতিক চৌবাচ্চা দেখা যাচ্ছিল। ওটাই তা হলে প্রস্রবণ। সামনে ন্যাড়া পাথরের পাহাড়ের নিচে কয়েকটা ভাঙাচোরা পাথরের ঘর। কর্নেল বললেন, জাপানিদের ঘাঁটির ধ্বংসাবশেষ। ওই পাঁচিলগুলো বাঙ্কার ছিল সম্ভবত। পাঁচিলে কামান এবং মেশিনগানের নল ঢোকানোর গর্তগুলো এখনও টিকে আছে।

উনি বাইনোকুলারে দেখতে থাকলেন। হালদারমশাইও বাইনোকুলার চোখে রেখে হাঁটু দুমড়ে বসে পড়লেন। একটু পরে একটা বাঙ্কারের আড়াল থেকে একটা লোক বেরিয়ে চারদিক দেখে নিল। তার হাতে রাইফেল। শৈলশিরার ফাক দিয়ে আসা রোদের কাছে আসতেই চিনতে পারলাম তাকে। আমাদের গার্ড কোয়া!

ডঃ ভাস্কো রাইফেল তাক করতেই কর্নেল বাধা দিলেন। ডঃ ভাস্কো চাপা স্বরে বললেন, বিশ্বাসঘাতক কোয়া তিকিকে গোপনে তার সঙ্গে পালাতে বলেছিল। গুপ্তধনের লোভ দেখিয়েছিল।

কর্নেল বললেন, একটু অপেক্ষা করুন।

কোয়া প্রস্রবণের ধারে গিয়ে রাইফেল রেখে আঁজলা ভরে জল খেল। তারপর পায়ের জুতো খুলে পা চুবিয়ে বসে রইল। আইউং ফিসফিস করে বলল, তাহিতির লোকের এই বিচ্ছিরি অভ্যাস! ঘন্টার পর ঘন্টা জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকবে।

কর্নেলের ইশারায় আমরা ডাইনে ঘুরে জাপানি ঘাঁটির কাছাকাছি চলে গেলাম। মাত্র বিশ মিটার দূরত্ব। বাঙ্কারের পেছনে দুজন লোক শাবল দিয়ে খুঁড়ছে। একজন পাশে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছে। ডঃ ভাস্কো শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বলে উঠলেন, এ কী? এ যে দেখছি গিলম্যান।

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ। আপনার সহকারী বিজ্ঞানী পিটার গিলম্যান।

কর্নেল বাধা দেওয়ার আগেই ডঃ ভাস্কো একলাফে বেরিয়ে গর্জন করলেন, নড়লেই খুলি উড়িয়ে দেব গিলম্যান!

পিটার গিলম্যান একলাফে ওপরে একটা ভাঙা ঘরে ঢুকে গেল। ওর সঙ্গী দুজনও ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওকে অনুসরণ করল। কর্নেল দৌড়ে গেলেন। ততক্ষণে ডঃ ভাস্কো এবং তিকি সেখানে পৌঁছে গেছে। আইউং এবং আমি দিয়ে দেখি দুটো রাইফেল পড়ে আছে। ভাঙা ঘরের ভেতর কয়েকটা ক্যাম্পখাট এবং আরও কিছু জিনিস। আমাদের ক্যাম্প থেকে লুঠ করে আনা জিনিসপত্রও নিশ্চয় ওর মধ্যে আছে। ডঃ ভাস্কো এবং তিকি ঘরে ঢুকে উধাও হয়ে গেল।

ঘরগুলো শৈলশিরার গায়ে। বারকতক গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু হালদারমশাই কোথায় গেলেন? কর্নেল বাঙ্কারের শেষপ্রান্তে গিয়ে বললে, বাঃ, হালদারমশাই, এই তো চাই!

গিয়ে দেখি, হালদারমশাই সবে প্রস্রবণ থেকে উঠছেন। একেবারে বেড়ালভেজা অবস্থা। তবে ওঁর হাতে এখন দুটো রাইফেল। মুখের জল মুছে বললেন, ব্যাটা বানর। পলাইয়া গেল।

বুঝলাম, কোয়ার রাইফেল বাগাতে পারলেও তাকে বাগাতে পারেননি। পুঁড়ি মেরে গিয়ে আগে তার রাইফেল হাতিয়ে ছিলেন। ভাগ্যিস কোয়া এদিকে পেছন ফিরে বসে ছিল। কর্নেল উদ্বিগ্নমুখে বললেন, ডঃ ভাস্কো ওদের তাড়া করে গেছেন। চলো তো দেখি।

বাঙ্কারের রাইফেল দুটোতে গুলি ভরা ছিল। কর্নেল এবং আমি সে-দুটো নিলাম। হালদারমশাই ধপাস করে বসে পড়লেন। আমরা একটার পর একটা ঘর পেরিয়ে গিয়ে দেখি, শৈলশিরার প্রকাণ্ড ফাটলের

পাশে একটা চাতালে দাঁড়িয়ে আছেন ডাঃ ভাস্কো এবং তিকি। ডঃ ভাস্কো হতাশ মুখে বললেন, নিচের খাড়িতে ওদের মোটরবোট ছিল। পালিয়ে গেল। এখানে একটা মোটা শেকল ঝুলছে। এটা বেয়ে ওরা উঠে এসেছিল। এটা বেয়েই নেমে গেছে।

কর্নেল বললেন, জাপানি সেনাদের কীর্তি। তবে আশ্চর্য, শেকলটা এখনও ছিঁড়ে যায়নি!

আমরা নিচে সেই বাঙ্কারে ফিরে এলাম। তারপর একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠলাম। হালদারমশাই বাঙ্কারে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছেন। ভিজে রাইফেল দুটো তবু ছাড়েননি। মুখে আতঙ্কের ছাপ। তবু কাকে ধমক দিচ্ছেন, আর আউগ্‌গাইলেই খুলি উড়াইয়া দিমু! আবার আউগ্‌গায়? শ্রীবিষ্ণুরে ডাকুম নাকি? দ্বাপরে ব্যাদ চুরি করছিলা। শ্রীবিষ্ণু তোমার ঘাড় মটকাইয়া মারছিলেন। মনে নাই!,

হ্যাঁ, সেই সাংঘাতিক হয়গ্রীবই বটে। কালো লোমে ঢাকা দুপেয়ে প্রাণীটির মুখ অবিকল ঘোড়ার মতো। মোটাসোটা, হিংস্র দাঁত বেরিয়ে আছে। সে বিকট চিঁহি করে উঠতেই কর্নেল আমাদের অবাক করে আচমকা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রাণীটি অমনই ধরাশায়ী হল। ডঃ ভাস্কো, তিকি এবং আমি রাইফেল বাগিয়ে ঘিরে ধরলাম। কর্নেল একটানে ঘোড়ার মুঠা উপড়ে নিতেই এক সায়েবের মুখ দেখা গেল।

কর্নেল তার পিঠের বোতাম পটাপট ছাড়িয়ে ফেলে কালো লোমে ঢাকা খোলসটি খুলে ফেললেন। ডঃ ভাস্কো কিছু বলার আগেই তিকি বলে উঠল, আরে! এ তো দেখছি সেই ফেরারি জলদস্যু জন হফগ্রিব!

হালদারমশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হাঁ! হয়গ্রীব।

ডঃ ভাস্কো সহাস্যে বললেন, মার্কিন সরকার এর মাথার দাম ঘোষণা করেছে পঞ্চাশ হাজার ডলার! যাক। পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের কিছুটা উসুল হবে। আইউং! তিকি! হগ্রিবকে বেঁধে ফেলল। ওই ঘরে দড়ি আছে দেখলাম।

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, এর ডেরা খুঁজে বের করতে হবে। সেখানে একালের এই জলদসর গুপ্তধন থাকতে পারে।

হফগ্রিব মিউমিউ করে বলল, আমার কোনও ডেরা নেই। গুপ্তধনও নেই! আমি প্রাণ বাঁচাতে এই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন মশাইরা!

ডঃ ভাস্কো ধমক দিলেন, চুপ, তুমি খুনি। অমার তিনটে লোককে খুন করেছ।

জন হফগ্রিবকে বন্দি করে ক্যাম্পে ফেরার পথে কর্নেল বললেন, এই লোকটা কোকো দ্বীপের ভয়ঙ্কর কিংবদন্তির সুযোগ নিয়েছিল, যাতে কেউ সাহস করে দ্বীপে পা না দেয়। ওকে দেখেই সি-গাল পাখিরা

ভয় পেয়েছিল। তবে ওর ডেরা নিশ্চয় আছে কোনও গুহায়। বাঘনখ জাতীয় অস্ত্রও আছে। ও গুলির শব্দ শুনে দেখতে এসেছিল কী ব্যাপার।

হালদারমশাই হঠাৎ করুণ মুখে বললেন, কিন্তু ফিরে যাব কেমন করে?

আইউং হাসতে হাসতে বলল, ভাববেন না। কলাগাছের ভেলা তৈরি করব। হাঙর কলাগাছের গন্ধ সহ্য করতে পারে না।

সমাপ্ত